স্বজন যখন দুশমন হয়

জহুরী

www.nagorikpathagar.org

স্বজন যখন দুশমন হয়

জহুরী

পরিবেশনায়

তাসনিয়া বই বিতান

www.nagorikpathagar.org

— স্বজন যখন দুশমন হয় —

প্রকাশক
মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন
পূর্ব ক্যানাল পাড়, খাজানগর
জগতি, কুষ্টিয়া

[সর্বস্বত্ব লেখকের]

প্রথম মুদ্রণ
আগস্ট ২০০০ সাল

কম্পিউটার কম্পোজ
তাসনিয়া কম্পিউটার

মুদ্রণে
আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ এঁকেছেন
ইব্‌রাহীম মণ্ডল

মূল্য
টাকা ৬৫.০০ মাত্র

www.nagorikpathagar.org

আমার স্কুল জীবনের একমাত্র জীবিত শিক্ষক জনাব জয়াদুর রহমানের দস্ত মোবারকে এই নগণ্য তোহফা তুলে দিয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি

-জহুরী

www.nagorikpathagar.org

সূচী

স্বজন যখন দুশমন হয়	...	৭
আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী	...	২২
আমেরিকার সদর অন্দর		২৭
বৃটেনের সদর অন্দর	...	৪১
নিজের আয়নায় চৌধুরী	...	৫০
ডক্টর আহ্‌মদ শরীফ	...	৫৯
ডঃ হুমায়ুন আজাদের দৃষ্টিতে আহ্‌মদ শরীফ	...	৬৩
পাকা নাস্তিকের পাকা স্পষ্ট কথা	...	৬৪
তিনি মানুষ থাকতে পারলেন না	...	৬৮
খাসলতের খুঁজলি পাঁচড়া	...	৭১
ডঃ শরীফের বিচ্ছিন্ন বিভ্রান্ত সংলাপ	...	৭৫
নাস্তিকদের জন্য অনুসরণীয় এক দৃষ্টান্ত	...	৭৯
একটি লাশই এক ইতিহাস	...	৮৬
সরদার আলাউদ্দিন	...	৯৩
সিলেটে কি ঘটেছিল?	...	৯৪
রক্ত শপথে মহীয়ান তুমি আঠারোই ফাল্গুন	...	১০৬

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

জহুরী সাহেবের লেখার সঙ্গে আমি বহু বছর থেকে পরিচিত। সেই সুবাদে তার লেখা বইয়েরও আমি একজন আগ্রহী পাঠক। আল্‌হামদুলিল্লাহ, এখন আমি তার বইয়ের একজন প্রকাশক হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত হলাম। প্রকাশকের দায়িত্ব নিয়ে আমি বেশ আত্মতৃপ্তি বোধ করছি।

তার লেখা পুস্তক 'স্বজন যখন দুশমন হয়' আমার দায়িত্বে প্রথম প্রকাশ। পুস্তকের নামটি আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। পান্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে বুঝতে পারলাম, নামকরণটি স্বার্থক হয়েছে। সত্যিই, স্বজন যখন দুশমন হয়ে যায়, তখন তার মত ভয়ংকর দুশমন আর কেউ হতে পারে না। ইসলামের শত্রু যখন মুসলিম নামের কোন ব্যক্তি হয়, তখন ইসলামের বড় শত্রু সে-ই হয়। বাহিরের শত্রুকে ইসলাম কখনো ভয় করে না। ইসলামের যত ভয় ঘরের শত্রুকে। কারণ, তার দেহে থাকে স্বজনের পোশাক। নামও থাকে মুসলমানী। জহুরী সাহেব এমন স্বজন তিনজনকে চিহ্নিত করে তাদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন, আসল পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাদের প্রত্যেক আক্রমণের দাঁত ভাঙ্গা জবাব তিনি দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তার কলমকে আমি দেখেছি বিজয়ী তলোয়ার হিসেবে। তাদের যুক্তিকে আঘাত করে প্রমাণ করেছেন, সবই কুযুক্তি ও মিথ্যাচার।

স্বজনবেশী অন্য দুশমনদেরও তিনি বর্ণানুক্রমে ধারাবাহিকভাবে দেশবাসীর সামনে হাজির করবেন একের পর এক। এই সিরিজের বাকি বইগুলো প্রকাশের ইচ্ছা, যদি আল্লাহ এই ইচ্ছাকে কবুল করেন। আমি মনে করি, তথ্যানুসন্ধানী পাঠকদের সংগ্রহে থাকার মত একখানা বই।

আল্লাহ আমার এই বিনিয়োগ কবুল করুন, তার কাছে আমার এই মোনাজাত।

মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন

www.nagorikpathagar.org

লেখকের কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ। 'স্বজন যখন দুশমন হয়' শিরোনামের পুস্তকখানা প্রকাশকের আন্তরিক সহযোগিতায় এখন পাঠকের হাতে। এ জন্য অযুত শুকরিয়া জানাই আল্লাহ্ পাকের দরবারে।

প্রকাশকের তাগাদায় যে সব লেখক বই লেখেন, তারা বড় মাপের লেখক। আমার মান ও ওজন তাদের মত নয়। আমি বই লিখি নিজের ঈমানের তাগিদে। নিজের বই নিজে প্রকাশ করতে পারি না অর্থাভাবের কারণে। প্রকাশকরাও এগিয়ে আসেন না, কারণ, আমি এত দামী লেখক নই বলে। এতদসত্ত্বেও যে দু'একজন এগিয়ে আসেন, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

জনাব মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন এগিয়ে এসে পুস্তকখানা প্রকাশের দায়িত্ব নেন। বইয়ের ভিতরের কথা বলবো না, কারণ, বই তো আপনার হাতে রয়েছে। এ বইতে তিনজনের দুশমনীর কথা স্থান পেয়েছে। আগামীতে অন্যদের নিয়ে আরো কয়েকটি বই করার ইচ্ছা আছে। যদি আল্লাহ্ পাক এই ঈমান, স্বাস্থ্য ঠিক রাখেন আর হায়াত দারাজ করেন।

তাসনিয়া বই বিতানের মালিক জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রব-এর সর্বাত্মক সহযোগিতার কারণেই বইটি আলোর মুখ দেখেছে, তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

আল্লাহ পাক আমার এ মেহনত যেন কবুল করেন, পাঠকদের কাছেও এ দোয়া চাই।

জহুরী

স্থায়ী ঠিকানা	যোগাযোগের ঠিকানা
গ্রাম ও ডাকঘর-কদমরসুল	তাসনিয়া বই বিতান
থানা-গোলাপগঞ্জ	৪৯১/১, ওয়্যারলেস রেলগেট
জিলা-সিলেট	বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.nagorikpathagar.org

স্বজন যখন দুশমন হয়

স্বজন যখন দুশমন হয়, তখন এই দুশমনের চেয়ে অধিকতর বিপজ্জনক ও ভয়ংকর দুশমন আপনার বা আমার ভুবনে আর কেউ যে হতে পারে, এমন চিন্তাও করা যায় না। তবে হ্যাঁ, একাধিক স্বজন যদি একই সাথে বা পর্যায়ক্রমে আপনার দুশমন হয়ে যায়, তাহলে কোন্ দুশমন সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক বা ভয়ংকর, তা নিরূপণ করা খুব কঠিন। স্বজনের হালকা শ্লেষাত্মক কথাও অ-স্বজনের অস্ত্রাঘাতের চেয়েও মারাত্মক ও বেদনাদায়ক হয়, তা সর্বজন স্বীকৃত ব্যাপার। শুধু অনুভব আর অনুভূতি দ্বারাই যে স্বজনের আঘাতের গভীরতা নিরূপিত হয়, তাই নয়। বাস্তবেও তারা বিরাট ক্ষতি সাধন করে, যা অনেকে আগে কল্পনাও করতে পারেন না। স্বজনদের পারস্পরিক শত্রুতার অবসান বা ফয়সালা খুব কমক্ষেত্রে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় না। নিষ্পত্তির নিক্তিতে দুপক্ষের দোষগুণের ওজন করার সুযোগও থাকে না। নানা কারণের গর্ভ থেকে কলহের কারণ জন্ম নেয় এবং তা গায়ে-গতরে বড় হয়, কথার পৃষ্ঠে কথা সৃষ্টিও হয়, অতঃপর তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, মারামারি, মামলা-মোকদ্দমা এমনকি খুন-খারাবি পর্যন্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এ শত্রুতা বংশ পরম্পরা পর্যন্ত চলতে থাকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'স্বজন' বলতে আমরা কি বুঝি, কা'দের বুঝি এবং স্বজন কি কারণে এবং কখন দুশমন হয়?

স্বজন মানে আপনা লোক, নিজের লোক, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, রক্ত সম্পর্কিত স্বজন। (স্ব+জন), রক্ত সম্পর্ক ছাড়াও স্বজন, মনের মিলের দিক থেকেও নিবিড় ও ঘনিষ্ঠজনও স্বজন। যেমন বন্ধু-বান্ধব, চেনা-জানা পরিচিত মহল। যারা একই ঔরসে ও একই গর্ভে জন্ম নেয়, তারা তো একে অন্যের সবচেয়ে নিকটতম স্বজন। একই ধর্ম বন্ধনে আবদ্ধ স্বজাতিও স্বজন। দূরতম সম্পর্কেও স্বজন হয় দেশবাসী। দলীয় আদর্শ বন্ধনে আবদ্ধ যারা, তারাও পারস্পরিক

www.nagorikpathagar.org

পরিচয়-পরিচিতিতেও স্বজন। এভাবে শ্রেণী ভাগ করলে স্বজনদের অনেক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীভুক্ত স্বজন, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত স্বজন, তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত স্বজন-এভাবে শ্রেণী বাড়াতে গেলে বাড়তেই থাকবে। আবার সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রমিক নম্বরের অদলবদল ও আগ-পিছও হয়।

স্বজনের শ্রেণী ভাগ গুণগত দিক দিয়েও অনেক করা যায়। তবে এখানে আমি মূল আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি শ্রেণীতেই ভাগ করছি।

(১) রক্ত সম্পর্কীয় স্বজন। যেমন ভাই-ভাই, ভাই-বোন, বোন-বোন, তারপর চাচা, চাচাতো ভাই-বোন, মামা, মামাতো ভাই-বোন, ফুফু ও ফুফাতো ভাই-বোন। বৈমাত্রেয় ভাই-বোনও এর অন্তর্ভুক্ত। সর্বোপরি মা-বাবা, দাদা-দাদি তো রয়েছেনই। রক্ত সম্পর্কীয় স্বজনদের মধ্যে দুশমনি শুরু হলে তা হয় খুবই ভয়ংকর।

(২) রাজনৈতিক দলীয় আদর্শের অনুসারী স্বজন। এ স্বজনদের মধ্যে দুশমনি শুরু হলে মুহূর্তে গলাগলি পরিণত হয় গালাগালিতে। কাল যিনি ছিলেন নন্দিত আজ তিনি জঘন্যভাবে হোন নিন্দিত।

(৩) ধর্মীয় আদর্শের বন্ধনে আবদ্ধ স্বজনদের বন্ধন সব সময় মজবুত হওয়ার কথা। কিন্তু ধর্মের নিষ্ঠার অভাবে বন্ধন প্রায় ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে পড়ে। যারা দ্বীনের লাইন থেকে লাইনচ্যুত হয়ে যায়, তারা মারাত্মকভাবে দুশমনি শুরু করে ধর্ম ও জাতির বিরুদ্ধে। আমার এই পুস্তকের তিন চরিত্রই এর বড় প্রমাণ। তারা মুরতাদ হয়ে নিজেরাই বরবাদ হয়ে গিয়েছেন। ধর্মের ভিত্তিতে যে জাতি, সে জাতির মধ্যে বজ্জাতেরও পয়দা হয় অনেক।

তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত এই বজ্জাত, মুরতাদ ও নাস্তিকদের অনেকেই ছিলেন সুখ্যাতিসহ স্বজন। তারা নানা টোপ গিলে ইবলিস শয়তান হয়ে যান। এই স্বজনরা কিভাবে দুশমন হলেন, এখানে এ আলোচনা করবো না। গোটা পুস্তকই সে আলোচনার ক্ষেত্রে।

আমি এখানে রক্ত সম্পর্কীয়, আত্মীয় সম্পর্কীয় স্বজনদের পারস্পরিক দুশমনির আলোচনা করে ইতিহাস থেকেও স্বজনদের বিরুদ্ধে স্বজনদের লড়াই ও প্রাণ সংহারের অনেক দৃষ্টান্ত পাঠকদের খেদমতে পেশ করবো।

আগেই প্রশ্ন রেখেছিলাম, এক স্বজন বা একদল স্বজন অন্য এক স্বজন বা একদল স্বজনের বিরুদ্ধে শত্রুতা কেন শুরু করে? এর উত্তর আমাদের পাওয়া

www.nagorikpathagar.org

দরকার। এ প্রশ্নের উত্তর অতি সোজা এবং সংক্ষিপ্ত। এক কথায় বলা যায়, নিজ নিজ স্বার্থের কারণে অথবা স্বজনের উন্নতিতে ঈর্ষা-পীড়িত হয়ে দুশমনি শুরু করে। স্বধর্মের নামধারী মুরতাদ নাস্তিকরা দুশমনি করে ভিন্ন কারণে।

ভাই-ভাইয়ে, ভাই-বোনে, বোনে-বোনে, চাচা-ভাতিজায়, মামা-ভাগিনার মধ্যে দুশমনি শুরু হয় প্রধানত বৈষয়িক স্বার্থে। শৈশবে বা বালক বয়সে যে সব ভাই-বোন এক সঙ্গে খেলাধূলা করেছে, লেখাপড়া করেছে, এক সঙ্গে খানাপিনা করেছে, একে অন্যকে ভালোবেসেছে, বয়স যত বাড়তে থাকে, পারস্পরিক আদর-স্নেহ ও ভালোবাসায় ভাটা তত পড়তে থাকে। বিয়ে-শাদীর পর বা চাকরি অথবা ব্যবসায় নামার পর বৈষয়িক স্বার্থ অধিকাংশের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠে যে, আত্মকেন্দ্রিকতা অনেককে অন্ধ করে ফেলে। প্রায় ক্ষেত্রে স্ত্রীরা নেপথ্যে থেকে কলকাঠি এমনভাবে নাড়েন, যার ফলে এক ভাই অন্য ভাইয়ের শত্রুতে এক সময় পরিণত হয়ে যায়। মা-বাবা সন্তানদের থেকে যা পাওয়ার প্রত্যাশা করেন, তা না পেলে বা মোটেই না পেলে বাপ-বেটা, মা-বেটার সম্পর্কেও চিড় ধরে। পিতার সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারার সময় অনেকেই অধিক প্রাপ্তির আশায় দংশনের জন্য ফণা তোলেন। মোটকথা, কখনো কখনো ইন্ধন যোগান স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ি ও শালা-সম্বন্ধীরা, গ্রামের বা মহল্লার ধুরন্ধররা। আমাদের সংসার এসব কারণেই ভাঙ্গছে, নিঃস্ব হচ্ছে। ভাইয়ে-ভাইয়ে, পিতা-পুত্রে, চাচা-ভাতিজায়, মামা-ভাগিনায় মামলা-মোকদ্দমা এমনকি খুন-খারাবি পর্যন্ত হচ্ছে। পিতা যখন পুত্রের শত্রু হয় বা পুত্র হয় পিতার শত্রু, এক ভাই যখন হয় অন্য ভাইয়ের শত্রু বা এক বোন হয় অন্য বোনের শত্রু, চাচা যখন শত্রু হয় ভাতিজার বা ভাতিজা শত্রু হয় চাচার এবং স্বামী শত্রু হয় স্ত্রীর আর স্ত্রী শত্রু হয় স্বামীর বা এক বন্ধু হয় অন্য বন্ধুর শত্রু; তখন কি ভয়ঙ্কর অবস্থা যে দাঁড়ায় তা কল্পনা করতেও গা শিউরে উঠে। লক্ষণীয়, যাদের কথা বললাম, প্রত্যেকেই একে অন্যের এক নম্বর স্বজন। কিন্তু বিধিবাম হলে তারাই হয় একে অন্যের এক নম্বর দুশমন। আমাদের দেশে বা বিশ্বের সব দেশেই আদালতে যত মামলা-মোকদ্দমা হয়, এ সবের অধিকাংশই হয় স্বজনের বিরুদ্ধে স্বজনের, বন্ধুর বিরুদ্ধে বন্ধুর। আমরা যে যেখানে আছি, সেখানে দাঁড়িয়েই সমাজের চারদিকে তাকালে দেখবো, রক্ত সম্পর্কের, আত্মীয়তা সম্পর্কের আর বন্ধু সম্পর্কের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ, হানাহানি, মারামারি, খুনাখুনি আর মামলা-মোকদ্দমা অজস্র।

এবার আসুন, পারিবারিক রাজনীতির ইতিহাস থেকে একের পর এক দৃষ্টান্ত

www.nagorikpathagar.org

দিয়ে এর সত্যতা প্রমাণ করি। কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি খ্রিস্টান আর কি মুসলমান প্রত্যেক জাতির ইতিহাসই স্বজনদের মধ্যকার লড়াইয়ে আর খুন-খারাবিতে ভরপুর।

আদম (আঃ)-এর প্রথম সন্তান কাবিল, তৎপর হাবিল। কুরআনে তাদের উল্লেখ রয়েছে (৫ ঃ ৩০-৩১)। প্রতিবার তাঁদের যমজ সন্তানের জন্ম হতো, একটি পুত্র ও একটি কন্যা। আদম (আঃ) প্রত্যেক পুত্রের সঙ্গে তার যমজ ভগ্নির বিবাহ দিতেন। ছালাবীর মতে, আদম (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা তার জীবিত কালেই ছিল ৪০ হাজার। কালামে পাকে আছে, 'অতঃপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃ হত্যায় উদ্বুদ্ধ করলো। সে তাকে হত্যা করলো। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ এক কাক প্রেরণ করলেন। সে মাটি খনন করছিল। যাতে শিক্ষা দেয় (কাক) আপন ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে। সে বললো, আফসোস! আমি কি এ কাকের সমতুল্য হতে পারলাম না যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ আবৃত করি। অতঃপর সে অনুতাপ করতে লাগলো।

ভাই ভাই। ভাইয়ের স্বজন ভাই। এখানে হত্যার মাধ্যমে দুশমনির দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হলো। স্বজন যখন দুশমন হয়, তখন হত্যার মত ঘটনাও ঘটে। মানব ইতিহাসে স্বজনের বিরুদ্ধে স্বজনের শত্রুতায় প্রাণ নিধনের এটি প্রথম দৃষ্টান্ত। এরপর আরও বহু ঘটনা ঘটেছে। কিছু কিছু ইতিহাসে আছে, অধিকাংশই নেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিবরণ আমাদের অজানা। এ জন্য সে যুগের নাম প্রাগৈতিহাসিক যুগ। বৈদিক যুগ থেকেই শুরু করা যাক।

মহাভারত বৈদিক সাহিত্যের অংশ বিশেষ The Mohabharata is a story or a hero-land belonging to the later vedic Period. (R. D. Banerjee : Pre-historic ancient and Hindu India-P-47) অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'The Mohabharata could not have been the work of any single person and in order tobe brought up to its present size. The Process of interpolation must have gone on for several centuries. It can not, therefore, be said that the Mohabharata depicts the state of India at any particular period (R. D. Banerjee : Pre-historic ancient and Hindu India-P-47).

www.nagorikpathagar.org

এতদসত্ত্বেও মহাভারত ও রামায়ণকে দু'জন কবির লেখা দু'টি মহাকাব্য বলে মনে করা হয়। যদিও ঐতিহাসিক সত্যতা এর বিপরীত। বলা হয়ে থাকে মহাভারত রচনা করেন বেদব্যাস আর রামায়ণ রচনা করেন বাল্মীকি। রামায়ণের রচনার মূলে রয়েছে একজন কবির অবদান, এটা অধিকাংশ গবেষকের মতামত। যা হোক, ঐতিহাসিক আর ডি মুখার্জি, এল কে মুখার্জি, ডঃ কিরণচন্দ্র চৌধুরী এবং অন্যান্য হিন্দু ও ইংরেজ ইতিহাস গবেষক স্বীকার করেছেন, মহাভারতে বর্ণিত নায়কদের অনেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু রামায়ণ নিছক কবি কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষণ, সীতা অপহরণ, রাম রাবণের যুদ্ধ, অযোধ্যার রাম মন্দির ইত্যাদি কাল্পনিক কিস্‌সা ছাড়া আর কিছু নয়। The Ramayana is solely the Production of a Poet's brain or imagination, the Mohabharata Possesses a solid Substratum of Historical truth. Most of its heroes were real men and much of the Framework of the story is historically correct. ibid P-47-48

The Ramayana is in truth artificial in both senses, for one can not believe the tale. (Camb, history of India Vol 1 P-264).

এবার মূল আলোচনা শুরু করা যাক। মহাভারত আর রামায়ণ যাদের দ্বারা বা যেভাবেই রচিত হোক, এসবের মধ্যে বিধৃত ঘটনাই আলোচনার মূল উপাদান। স্বজন কিভাবে দুশমন হয় এবং এক স্বজন অন্য স্বজনের কিভাবে ক্ষতি করে, এ সত্যকে এখানে তুলে ধরার জন্য এ প্রয়াস।

মহাভারত : প্রাচীনকালে (বর্তমান মীরাট জেলায়) হস্তিনাপুর নামে এক রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের রাজার নাম ছিল বিচিত্রবীর্য। বচিত্রবীর্যের ছিল দুই ছেলে। ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন অগ্রজ; কিন্তু ছিলেন জন্মান্ধ। এ কারণে পাণ্ডু ক্ষমতার সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু পাণ্ডু তার বড় ভাই ধৃতরাষ্ট্রের জীবদ্দশায়ই পাঁচ পুত্র (যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব) রেখে মারা যান। পাণ্ডুর ছেলে এই পাঁচ ভাই ইতিহাসে পঞ্চপাণ্ডব নামে খ্যাত। এই পঞ্চপাণ্ডব পঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা দ্রোপদীকে বিয়ে করেন। পাঁচ ভাই কিভাবে এক মহিলাকে বিয়ে করেন, এ সম্পর্কে ভিন্ন কাহিনী আছে। যাহোক, অপরদিকে ধৃতরাষ্ট্রের ছিল দুর্যোধন, দুঃশাসনসহ একশত পুত্র। পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে বিয়ে

www.nagorikpathagar.org

করায় তাকে ভোগ করার ক্ষেত্রে শুরু হলো মনোমালিন্য। এই মনোমালিন্য দূর করার জন্য ভোগ-রুটিন তৈরি করা হলো। কিন্তু রুটিন পালন করতে গিয়ে সময়ানুবর্তিতার হেরফের ঘটার কারণে কোনো কোনো দিন অঘটনও ঘটতো। এসব ঘটনাভিত্তিক অনেক কাহিনীও আছে। অর্জুন তাতে খুবই বিব্রত বোধ করেন। তিনি এজমালি স্ত্রী ভোগের ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য মথুরা ও দ্বারকার যাদব রাষ্ট্র সংঘের নেতা শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে বিয়ে করে দ্রোপদীকে চার ভাইয়ের জন্য ছেড়ে দেন। কিন্তু দ্রৌপদীর ওপর যুধিষ্ঠির কর্তৃত্ব ও প্রভাব ছিল বেশি। এখানে লক্ষণীয়, শত্রুতার বাতাস যেন নাড়া দিয়ে গেল।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পাণ্ডবগণ পৈতৃক সম্পত্তির দাবি করলে ধৃতরাষ্ট্রের রক্তে স্বার্থের ধাক্কা লাগে। ধৃতরাষ্ট্র ভাগ বাটোয়ারায় রাজি হলেন বটে এবং ভাগ বাটোয়ারাও করে দিলেন, কিন্তু তিনি নিজের ছেলেদের জন্য হস্তিনাপুর রাজ্য রেখে দিয়ে কুরু রাজ্যের দক্ষিণে খান্ডব অরণ্য ভ্রাতুষ্পুত্রদের দিলেন। এই ভাগ বাটোয়ারায় পঞ্চপাণ্ডব মোটেই খুশি হননি, কিন্তু তখন তাদের করার মতও কিছু ছিল না। বাধ্য হয়ে যা পেলেন, তাই গ্রহণ করলেন। পঞ্চপাণ্ডব বর্তমান দিল্লির কাছে ইন্দ্রপ্রস্থ নামক স্থানে এক নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। অল্প কালের মধ্যেই পাণ্ডবগণ মগধরাজ জরাসন্ধকে পরাজিত করে রাজ্যের চতুর্দিকে আধিপত্য বিস্তার করে সম্রাট-পদবি মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার জন্য রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন। এ অনুষ্ঠানে তারা আমন্ত্রণ জানান ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের। এ নিমন্ত্রণই ছাই-চাপা আগুনকে লেলিহান শিখায় যেন পরিণত করলো। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মধ্যে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। পাণ্ডবদের একটি উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য তারা মাতুল শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে বিশেষ এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। শকুনি পরামর্শ দিল, কিছু শর্ত আরোপ করে তোমরা যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় আহ্বান করো। যুধিষ্ঠির যদি পাশা খেলায় পরাজিত হয়, তাহলে ১২ বছর বনবাস এবং ১ বছর অজ্ঞাতবাস করতে হবে। যুধিষ্ঠির এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কৌরবদের সঙ্গে পাশা খেলায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু যুধিষ্ঠির খেলায় হেরে যান। শুধু তিনিই হারেননি, দ্রৌপদীসহ সর্বস্ব হারান। এদিকে কৌরবেরা দ্রৌপদীকে পেয়ে মহাখুশি। প্রকাশ্য সভায় তার সম্ভ্রম লুটতে চেষ্টা চালায়। এ সম্পর্কেও অন্য এক কাহিনী আছে। অপরদিকে পাশা খেলার শর্তানুসারে যুধিষ্ঠির রাজ্য ত্যাগ করে বার বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাসে চলে যান। তের বছর বনবাসে অতিবাহিত করে পাণ্ডবগণ কৌরবদের কাছে এসে রাজ্য দাবি

www.nagorikpathagar.org

করেন। দুর্যোধন ও তার ভাইয়েরা এ দাবি অস্বীকার করলে কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের মধ্যে এক ভীষণ লড়াই শুরু হয়। ভীষ্ম, দ্রোণকর্ণ প্রভৃতি বীরগণ কৌরব সৈন্য পরিচালনা করেন। পাণ্ডবদের নেতৃত্ব দেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ছিলেন অর্জুনের সারথি। ১৮ দিন ধরে এ যুদ্ধ চলে। অবশেষে জয় হয় পাণ্ডবদের। কৌরবরা হলো পরাজিত (ডঃ কিরণ চন্দ্র চৌধুরী-ভারতের ইতিহাস কথা-পৃষ্ঠা ৬২-৬৩)।

মহাভারতের এই মূল ঘটনার সবই স্বজনরা দুশমন হওয়ার বা স্বজনের বিরুদ্ধে স্বজনের লড়াইয়ের কাহিনী। (১) দ্রৌপদীকে ভোগের ক্ষেত্রে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়া, (২) অর্জুনের পৃথক বিবাহ, (৩) দ্রৌপদীর ওপর যুধিষ্ঠির বেশি প্রভাব খাটানো, (৪) আপন চাচার বেইনসাফীমূলক রাজ্য ভাগ, (৫) নিজ সন্তানদের জন্য হস্তিনাপুর রাজ্য রেখে দেয়া, ভাতিজাদের জঙ্গল এলাকা দেয়া, (৬) পাশা খেলায় চাচাতো ভাইয়ের স্ত্রীকে পণ হিসাবে ব্যবহার, (৭) প্রকাশ্য সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, (৮) চাচাতো ভাইদের বনবাসে প্রেরণ এবং (৯) একই রক্ত সম্পর্কিত ভাইদের মধ্যে ১৮ দিন রক্তাক্ত যুদ্ধ। এসবই স্বজনের বিরুদ্ধে স্বজনের শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ।

রামায়ণ : রামায়ণ কবি-কল্পনা হলেও সেকালের সমাজচিত্র দ্বারা কবি-কল্পনা প্রভাবিত। কল্পিত চরিত্রগুলো সে যুগের সমাজের মানুষের চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে একটি ঘটনার মাধ্যমে চিত্রায়িত করেছে, তা তো অস্বীকার করা যায় না। কল্পনা যদি রূপকথারও জন্ম দেয়, তাহলেও কল্পনাভিত্তিক রূপকথার একটা ধারাবাহিকতা থাকে এবং থাকে পাঠক-গ্রহণযোগ্যতা। রামায়ণের গোটা কাহিনী কাল্পনিক হলেও এর বহু ঘটনা মানব চরিত্রের মেজাজ ও চারিত্রিক বাস্তবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই তো তাতে দেখি বিমাতার চক্রান্তে রামচন্দ্রের বনবাস, সীতা হরণ, যুদ্ধ, সীতা উদ্ধার, প্রজাদের বিদ্রোহ, সীতা পরিত্যাগ, রাবণের বিরুদ্ধে রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণের সক্রিয় ভূমিকা ইত্যাদি প্রায় ঘটনায়ই স্বজনের বিরুদ্ধে স্বজনের শত্রুতার প্রকাশ ঘটেছে। কল্পনার গল্পেও বাস্তবতার যেন পরশ অনুভব করা যায়।

রামায়ণের গল্প হলো এই, বর্তমান অযোধ্যার ফৈয়জাবাদ জেলায় প্রাচীনকালে ইক্ষাকু বংশের রাজা দশরথ রাজত্ব করতেন। তার বড় ছেলের নাম ছিল রামচন্দ্র। উত্তর বিহারের বিদেহ রাজ জনকের কন্যা জানকী বা সীতাকে রামচন্দ্র বিবাহ করেন। রামচন্দ্রের বিমাতার নাম ছিল কৈকেয়ী। সে কিন্তু সব

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপারে চক্রান্তের জাল বিছানোতে সিদ্ধহস্ত ছিল। রামচন্দ্রের সুখের দাম্পত্য জীবন তার সহ্য হলো না। বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বছর দণ্ডকারণ্যে বাস করতে হয়েছিল। গোদাবরী নদীর তীরস্থ পঞ্চবটি বনে বাস করার সময় লংকার দ্রাবিড় রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করেন। রামচন্দ্র তো পড়লেন মহাসংকটে। কিভাবে সীতাকে উদ্ধার করা যায়, রাত-দিন চিন্তা করতে থাকেন। অবশেষে অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সিদ্ধান্ত নিলেন, লংকায় গিয়ে যুদ্ধ করে সীতাকে উদ্ধার করবেন। রামচন্দ্র তার ভাই লক্ষণকে এবং কিঞ্চিনধ্যার (বর্তমান বিলারি জেলা) বানর নেতা ও হনুমান এবং অনেক লোকজন ও সৈন্যসামন্ত নিয়ে রাবণের রাজ্য লংকায় উপস্থিত হন। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাবণ পরাজিত ও সবংশে নিহত হন। সীতাকে উদ্ধার করা হয়। এদিকে রামচন্দ্রের বনবাসকালে তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভরতই রামচন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে অযোধ্যার শাসন কার্য পরিচালনা করেন। রামচন্দ্রের বনবাস-শোকে বৃদ্ধ রাজা দশরথের মৃত্যু ঘটে। সীতাকে উদ্ধার করে রামচন্দ্র নিজ রাজ্যে নিয়ে আসেন কিন্তু প্রজারা সীতাকে রানী হিসাবে গ্রহণ করতে আপত্তি জানায়। তার সতীত্বের ওপর প্রশ্ন রাখে। উভয় সংকটে পড়লেন রামচন্দ্র। সীতাকে ত্যাগ না করলে রাজ্য হারাতে হয়, কারণ, প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। আবার ক্ষমতার সিংহাসনে বসতে হলে সীতাকে হারাতে হয়। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর রামচন্দ্র পরমাত্মীয়, স্বজন, জীবন সঙ্গিনী, ধর্ম সঙ্গিনী সীতাকে ত্যাগ করে ক্ষমতার সিংহাসনই গ্রহণ করেন। ক্ষমতার মোহের কাছে স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা পরাস্ত হলো।

রামায়ণে বর্ণিত কাহিনীতে দেখা যায়, স্বজনদের দুশমন হওয়ার অনেক ঘটনা। (১) কৈকেয়ী রামচন্দ্রের বিমাতা হলেও স্বজনতো ছিল, কিন্তু সে হয়ে গেল দুশমন। এ স্বজনই তার সতীন-সন্তানকে নানা ষড়যন্ত্রের ফাঁদ বিছিয়ে চৌদ্দ বছর বনবাসে কাটাতে বাধ্য করে। (২) বিভীষণ ছিল রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে স্বজন না বললে আর কাকে স্বজন বলা যায়? কিন্তু এত বড় স্বজন হয়ে গেল এক নম্বর দুশমন। (৩) যে প্রিয়তমা স্ত্রীকে উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র যুদ্ধ করলেন এবং স্ত্রীকে উদ্ধার করলেন, অথচ উদ্ধারের পর ক্ষমতার মোহে মোহাচ্ছন্ন হয়ে সেই স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন। স্বজন দুশমন হওয়ার এত বড় দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাসে আর ক'টা আছে?

বৌদ্ধ ও জৈনরা ছিল হিন্দু জাতি-গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত। বৈদিক যুগের শেষ

www.nagorikpathagar.org

ভাগে ব্রাহ্মণদের অতি বাড়াবাড়ি হিন্দুদের একটি শ্রেণীকে বিদ্রোহী করে তোলে। নিম্ন শ্রেণীর প্রতি উচ্চ শ্রেণীর ঘৃণা প্রদর্শন অন্যায় বলে বিবেচিত হতো না। জীব হিংসা ও মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা পরিণত হয়েছিল তাদের ধর্ম হিসাবে। ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠলো। জন্ম নিল জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম উভয়ই হিন্দু ধর্মের প্রতিবাদী (Protestant) ধর্ম। ওরা ছিল হিন্দুদের স্বজন, কিন্তু কালক্রমে হয়ে গেল দুশমন। এ জন্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা বৌদ্ধরা কতভাবে নির্যাতিত হয়েছিল, সেই বিয়োগান্তক ইতিহাস এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক নয়, তাই উল্লেখ করছি না। স্বজন থেকেই যে দুশমন হয়, শুধু এ কথাটি বলার জন্য সংক্ষেপে শুধু ইশারা দিয়ে রাখলাম।

তারপর মগধ সাম্রাজ্যের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করুন। সেখানেও দেখবেন স্বজনদের বিরুদ্ধে স্বজনদের লড়াই। ষোড়শ মহাজনপদের যুদ্ধে (খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও স্বজনে স্বজনে লড়াই হতো। কাশী কোশলের দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মগধ সাম্রাজ্যের অন্যতম সফল নৃপতি (অনেকে বলেন শিশুনাগ বংশের পঞ্চম নৃপতি) ছিলেন বিম্বিসার। তিনি ১৫ বছর বয়সে রাজপদে অভিষিক্ত হন। বিম্বিসারের পিতা তারই অঙ্গরাজ্যের অধিপতি ব্রহ্মদত্ত কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন। বিম্বিসারের পিতার আপন লোক ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। স্বার্থের লড়াইয়ে স্বজন-সম্প্রীতি কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

বিম্বিসার একই সাথে জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুগত ছিলেন। বিম্বিসারের মৃত্যু নিয়ে বৌদ্ধ গ্রন্থে ও জৈন গ্রন্থে দু'রকম ঘটনার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থে বলা হয়েছে, গৌতম বুদ্ধের সম্পর্কিত ভ্রাতা (Cousin) দেবদত্তের কুমন্ত্রণায় অজাতশত্রু নিজ পিতা বিম্বিসারকে হত্যা করেন। জৈন গ্রন্থে বর্ণিত আছে, অজাতশত্রু পিতাকে বন্দি করে রেখেছিলেন। কারণ, তার আংগুলগুলোতে পচন শুরু হয়েছিল। এ অবস্থায় তিনি যাতে বাহিরে না যান, এ জন্য পিতার বহির্গমন রোধ করার জন্য বন্দির আদেশ জারি করেন। পিতার বন্দি অবস্থায় রানী চেল্লনার পরিচর্যায় বিম্বিসারের অংগুলির ক্ষত নিরাময় হতে থাকে। এ সময়ে একদিন অজাতশত্রু ঘোষণা করলেন তিনি বন্দি পিতাকে দেখতে যাবেন এবং তাকে মুক্তি দেবেন। বিম্বিসার মনে করলেন, অজাতশত্রু আমাকে হত্যা করতে আসছে। এ মনে করে তিনি আত্মহত্যা করেন।

মূল ঘটনা হত্যা না আত্মহত্যা, এ নিয়ে বিতর্ক ছিল এবং এখনও বিতর্ক চলতে পারে। যদি ঘটনাটা আত্মহত্যা হয়, তাহলে প্রশ্ন, পিতার এ আত্মহত্যা

www.nagorikpathagar.org

কোন্ ভীতির পরিণাম? পুত্র আসার খবর শুনে পিতা কেন মনে করবেন যে, পুত্র আসছে তাকে হত্যা করতে? এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতার প্রতি পুত্রের আচরণ পূর্ব থেকেই বৈরীভাবাপন্ন ছিল। এই বৈরীতা এতই ভয়ংকর ছিল যে, পুত্রের আগমন সংবাদই তার কাছে ঘাতকের আগমন সংবাদ বলেই মনে হয়েছিল এবং পুত্রের হাতে নিহত হওয়ার চেয়ে আত্মনিধন শ্রেয়তর মনে করেছিলেন। ইতিহাস জোর দিয়ে বলে, অজাতশত্রু বিম্বিসারকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। বিম্বিসারের স্ত্রী কোশলদেবী স্বামীর শোকে মারা যান। কিন্তু অজাতশত্রুরই স্বজন উদয়ভদ্র কিছু দিন পর অজাতশত্রুকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ করেন। সবই হচ্ছে সবই ঘটছে স্বজনের বিরুদ্ধে স্বজনের। ওলপিয়াট বলেছেন, শত্রু মরে গেছে বলে আনন্দ করো না। কারণ, পুনরায় শত্রু হবেই। অজাতশত্রুর ক্ষেত্রে হলেও তাই।

শিশুনাগ বংশ (The Saisunagas) ঃ শিশুনাগ মগধের প্রাচীন রাজধানী গিরীব্রজ বা রাজগৃহের সমৃদ্ধি সাধন করে মগধকে উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তার মৃত্যুর পর তারই পুত্র কালাশোক বা কাকবর্ণ রাজা হলেন। কিন্তু তিনি রাজ সিংহাসনে বেশী দিন থাকতে পারেননি। তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে এবং তার দশ পুত্রকেও হত্যা করে নন্দ বংশের স্থাপয়িতা মহাপদ্ম নন্দ সিংহাসনে আরোহণ করেন। নন্দ বংশের মোট ৯ জন রাজা এ সিংহাসনে বসেই রাজত্ব করেন। নন্দ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধননন্দের পতন ঘটেছিল চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের হাতে।

মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত, মৌর্যের পুত্র বিন্দুসার। বিন্দুসারের পুত্র অশোক। এই অশোককে নিয়ে সম্প্রদায় বিশেষের গর্বের অন্ত নেই। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক ও তার ভ্রাতৃগণের মধ্যে ক্ষমতার উত্তরাধিকার নিয়ে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়। এ দ্বন্দ্বের অবসান কিভাবে ঘটে, ইতিহাসের প্রত্যেক ছাত্রই জানেন। অশোক তার ভ্রাতাদের প্রাণনাশ করে সিংহাসন নিষ্কন্টক করেন। কেটে যায় এভাবে নয় বছর। তারপর প্রস্তুতি নেন কলিঙ্গ বিজয়ের। কলিঙ্গ যুদ্ধ হয়েছিল অশোকের অভিষেকের নয় বছর পর। এই যুদ্ধে দেড় লাখ লোক অশোক-সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হয়, এক লাখ সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ হারায় এবং কয়েক লাখ লোক যুদ্ধের আনুষঙ্গিক কারণে যেমন লুটতরাজ, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতির ফলে মারা যায়।

(Even in such a small province as kalinga, as many

www.nagorikpathagar.org

100,000 were killed in the battlefield, many times as many died as the result of burning and sacking and what is more, no less man 1,50,000 were seized as slaves. (Asoka : Bhanderkar-Page-23)

অশোকের যাত্রা শুরু হয়েছিল ভ্রাতৃহত্যার মধ্যদিয়ে। অশোকের মৃত্যুর ৫০ বছরের মধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এরপর কুষাণ সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য, হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য তারপর উত্তর ভারতে যে সব হিন্দু রাজ্যের উত্থান ও পতন ঘটেছিল, ইতিহাসের সব পর্যায়ে দেখা যায় স্বজনদের বিরুদ্ধে স্বজনদের সংঘাত।

খ্রিস্টানদের ইতিহাসও স্বজনদের বিরুদ্ধে স্বজনদের রক্তাক্ত লড়াইয়ের ইতিহাস। এ সম্পর্কে পৃথক আলোচনা এখানে করলাম না এ জন্য যে, জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর ওপর যে আলোচনা করেছি, তাতে খ্রিস্টানদের রক্তাক্ত ইতিহাসকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছি। পাঠকগণ সে আলোচনা থেকে জানতে পারবেন।

মুসলমানদের ইতিহাস ঃ মুসলমানদের ইতিহাসও খুনে রাঙা। স্বজনে স্বজনে শত্রুতা, মারামারি, খুনাখুনি অজস্র। এ ক্ষেত্রে আমার অভিমত, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইতিহাসে স্বজনের বিরুদ্ধে স্বজনের দুশমনির যত ঘটনা বিধৃত, মুসলিম ইতিহাসে এ সংখ্যা হয়তো কম নয়। মুসলিম ইতিহাস থেকে এমন ঘটনার নির্ঘন্ট যদি খুব সংক্ষেপেও তৈরি করা যায় তাহলেও হাজার পৃষ্ঠার একখানা মহাগ্রন্থ হবে।

মুসলিম ইতিহাসে কেন এত রক্ত ও খুন (Blood and murders)? এর কারণ কার কাছে কি আছে তা আমি জানি না। তবে আমি ইতিহাস পাঠ করে এতটুকু জেনেছি বা বুঝেছি, যা কারণ হিসাবে উল্লেখ করলে ক্রমিক নম্বরে এভাবে পেশ করা যায়।

১। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এমনকি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইন্তিকালের আগ পর্যন্ত গোত্র ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ অর্থে স্বজনদের হাতে স্বজনরা খুন হয়েছে নীতি আদর্শ তথা দ্বীনের প্রয়োজনে। এক ভাই অন্য ভাইয়ের বিরুদ্ধে, পিতা তরবারী উত্তোলন করেছেন পুত্রের বিরুদ্ধে আদর্শগত কারণে। ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ক্ষমতার জন্য নয়।

www.nagorikpathagar.org

২। খোলাফায়ে রাশেদার আমল পর্যন্ত ছিল স্বজন বাছাইয়ের মাপকাঠি দ্বীন। এরপর শুরু হয় ঔরস প্রীতি, গোত্রপ্রীতি।

৩। ইসলাম ছাড়াই মুসলমান থাকার খেয়াল বা ইচ্ছাটা শয়তানরা মুসলমানদের ওপর যতই চাপাতে থাকলো, ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যাপক অনুশীলন শুরু হলো। এ পর্যায়ে স্বজন দুশমন হওয়ার মহামারীও শুরু হলো। কাকে অপসারণ, অপহরণ বা নিধন করে ক্ষমতা দখল করতে পারে, এ প্রতিযোগিতা চললো।

৪। এ পর্যায়ে ইসলাম শুধু আনুষ্ঠানিকতার প্রাইভেট ধর্ম ছাড়া আর তেমন কোন প্রভাব রাখলো না।

৫। দেশ শাসনে, দেশের মানুষের কল্যাণে এবং শাসকদের চলার মডেল, গাইড ও চালিকা শক্তি হিসাবে ইসলামের অনুসরণ-অনুকরণবোধ যে দিন থেকে লোপ পেল, সে দিন থেকে বংশীয় শাসন, পারিবারিক শাসন বিভিন্ন নামে শুরু হলো। অনেক মুসলিম দেশের নাম বলা যায়, সেসব দেশে স্বজন বনাম স্বজনের লড়াই হয়েছে এবং হচ্ছে।

শিখদের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহমদ শহীদের জেহাদ এক ট্রাজেডিতে পরিণত করলো কতিপয় পাঠান সর্দারের বিশ্বাসঘাতকতায়। স্বজন হয়ে গেল দুশমন। স্পেনের দুর্দিনেও মুসলিমদের অন্তর্দ্বন্দ্বের শেষ হলো না। আবুল হাসান যখন আল হামরা পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত, তখন তার পুত্র বু-আবদিল পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। গ্রানাডায় পুনরায় বু-আবদিল পিতার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। রাজ্যের ভবিষ্যত দুরবস্থার কথা চিন্তা করে আবুল হাসান আবু জাগালকে সিংহাসন দান করে ইল্লোরায় চলে যান এবং কিছু দিনের মধ্যেই ইন্তিকাল করেন। এদিকে জাগালের শেষ জীবন অত্যন্ত দুর্দশায় কাটে। তিনি অন্ধ অবস্থায় ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার গায়ে একটা লেবেল লাগানো থাকতো। তাতে লেখা ছিল, 'এই আন্দালুসিয়ার হতভাগ্য রাজা'।

মুসলিম শাসনাধীন ভারতে, বিশেষ করে মোগল আমলের শেষ দিকে স্বজনের হাতে স্বজন খুনের ঘটনা অনেক। মীর জাফর আলী তো সিরাজউদ্দৌলারই স্বজন ছিলেন। কিন্তু কাজটা করলেন কি? বাদশাহ ফয়সলের মত মহানুভব বাদশাহ শহীদ হন আপন ভাতিজার হাতে। স্বজনের হাতে স্বজন

www.nagorikpathagar.org

খুন। ইরাকের সাদ্দাম হোসেন নিজ হাতে খুন করেন তার দুই জামাইকে। এখানেও স্বজনের হাতে স্বজন খুন। অজস্র ঘটনা, কত বলা যায় আর লেখা যায়?

আমাদের দেশটার দিকে তাকিয়ে দেখুন। ছোট দেশ। আত্মীয়তার নানা বন্ধনে আমরা আবদ্ধ। সবাই যেন সবাইকে চিনি। একই ভাষায় কথা বলি। কিন্তু অবিরত লড়াই চলছে স্বজনের বিরুদ্ধে স্বজনের। ভাইয়ের হাতে ভাই খুন, ভাইয়ের হাতে বোন খুন, বোনের চক্রান্তে ভাই খুন, চাচার হাতে ভাতিজা খুন, ভাতিজার হাতে চাচা খুন, মামার হাতে ভাগিনা খুন, ভাগিনার হাতে মামা খুন, ভাগিনার হাতে মামা খুন, শ্যালকের হাতে দুলাভাই খুন, দুলাভাইয়ের হাতে শ্যালক খুন, শ্বশুরের হাতে জামাই খুন, জামাইয়ের হাতে শ্বশুর খুন, বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। পিতার হাতে পুত্র খুন, পুত্রের হাতে পিতা খুন, স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন তো আমাদের সমাজে বিরল ঘটনা নয়। আগেই বলেছি, মামলা-মোকদ্দমার অধিকাংশই স্বজনের বিরুদ্ধে স্বজনের। আমাদের দেশের আইন-আদালত আর থানা পুলিশ তো স্বজনদের মামলা-মোকদ্দমা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে পেরেশান। মোটকথা, কাবিল-হাবিল থেকে শুরু হয়েছে স্বজনের বিরুদ্ধে স্বজনের যে লড়াই, এ ধারা চলবে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত।

'স্বজন যখন দুশমন হয়'-এই শিরোনামের পুস্তকটিতে যে তিন জনের আলোচনা করেছি, তারাও স্বধর্মের পরিবার-পরিবেশে জন্ম নিয়ে এবং এ ধর্মের পরিচিতি বহন করা পর্যন্ত তারাও ছিলেন আমাদের স্বজন। পরবর্তী সময়ে নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে স্বধর্মের বিরোধিতা করে তারা হয়ে গেলেন আমাদের ধর্মের দুশমন।

বর্ণমালার ক্রমানুসারে অন্যরাও একই শিরোনামের পুস্তকে আগামীতে পাঠকদের সামনে আসবেন। 'আ' দিয়ে শুরু করলাম, ধীরে ধীরে অগ্রসর হবো একাধিককে নিয়ে।

স্বধর্মের নাম ধারণ করে, স্বধর্মের পরিচিতি নিয়ে, স্বধর্মের বিরুদ্ধে যে সব নাস্তিক, মুরতাদ, সেক্যুলারিস্ট লড়াই করছে, তারা রাজনীতির ঘাতকদের চেয়ে মারাত্মক। রাজনীতি ক্ষেত্রে রাজনীতির কারণে যেসব স্বজন দুশমন হয় বা দুশমনি করে, তারা ধর্মদ্রোহীদের মত এত খতরনাক ও ক্ষতিকারক নয়।

www.nagorikpathagar.org

মানব প্রকৃতিতে ভালো ও মন্দের উপাদান সর্বদা ক্রিয়াশীল রয়েছে। যে তার ভালোকে মন্দের ওপর বিজয়ী করেছে, সে সফল হয়েছে। যে তা করতে পারেনি, তার মন্দই ভালোর ওপর বিজয়ী হয়ে তাকে রসাতলে নিক্ষেপ করেছে। আল্লাহ্ পাক সূরা আল আসরে পরিষ্কারভাবে বলেছেন, 'কালের শপথ, মানুষ মূলত বড়ই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। সেই লোকজন ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে এবং একজন অপরজনকে হক উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্য ধারণের উৎসাহ দিয়েছে'।

সকল মানুষই মূলত ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত থাকলেও যাদের ক্ষতি কেউ করতে পারবে না, তাদের জন্য গাইড লাইন ও পথনির্দেশনা আল্লাহ্ সাথে সাথে দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহর রজ্জুকে সংঘবদ্ধভাবে ঈমানদাররা দৃঢ় হস্তে ধারণ করার যে নির্দেশ আল্লাহ্ পাক দিয়েছেন, তাও সামগ্রিকভাবে তথা জাতিগতভাবে 'ক্ষতি' থেকে রক্ষা পাওয়ার কুদরতী মহৌষধ। কালামে পাক যে আমাদের জন্য দুনিয়াতে চলা ও আখেরাতে নাজাত লাভের 'গাইড' তা সূরা বাকারার শুরুতেই আমরা পাঠ করে থাকি, কিন্তু আমল করি না। তাই ক্ষতির গহ্বর থেকে জাতিগতভাবে উদ্ধার লাভ যেমন সম্ভব হচ্ছে না, ব্যক্তিগতভাবেও উদ্ধার লাভের সৌভাগ্য ক'জনের হয়েছে, তা আল্লাহ্ পাকই ভালো জানেন। স্বজনে স্বজনে বিভক্তি, বিভাজন, হানাহানি, খুনাখুনি কি মুসলমানদের ললাট লিখন? এ প্রশ্নকেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, সহি হাদীস আমাদের সেদিকেই ইঙ্গিত করে। হাদীস হচ্ছে এই, আবদুল্লাহ্ বিন খাব্বাব আল আরত বদরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে সারা রাতভর নামাজ পড়তে দেখেন। সোবহে সাদেক পর্যন্ত তিনি নামাজ পড়েছেন। তিনি নামাজ থেকে সালাম ফিরালে খাব্বাব জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ), আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি এই রাতে এমন নামাজ পড়লেন, যা আর কখনো দেখিনি। তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, এটা ছিল আশা ও ভয়ের নামাজ। আমি আমার রবের কাছে তিনটি জিনিস চেয়েছি। তিনি দুটি দিয়েছেন, আর একটি নিষেধ করেছেন। আমি চেয়েছি, আমার উম্মাহকে যেন অন্যান্য জাতির মত ধ্বংস করা না হয়। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যেন দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস করা না হয়। এই দোয়া আল্লাহ্ মঞ্জুর করেছেন। আমি আমার রবের কাছে আমাদের ওপর নিজেরা ছাড়া অন্য জাতিকে বিজয়ী না করার প্রার্থনা জানিয়েছি। তিনি ঐ দোয়াও মঞ্জর করেছেন। আমি আরও দোয়া

www.nagorikpathagar.org

করেছি, আমাদের মধ্যে যেন বিভক্তি না হয়। তিনি তা কবুল করেননি। (নাসীরুদ্দিন আলবানী-রসুলুল্লাহর নামাজ, পৃষ্ঠা-৭৫, নাসাঈ, আহমাদ, তাবারানী। তিরমিযী এটিকে সহীহ হাদীস বলেছেন)।

আমি এ জন্যই বলেছিলাম, স্বজনে স্বজনে বিভক্তি কি আমাদের ললাট লিখন? আমার মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এই বিভক্তি মানব প্রকৃতিতে বিদ্যমান, মুসলমান ছাড়াও অন্যান্য জাতি-ধর্মের মধ্যেও এ বিভক্তি যে রয়েছে, সে সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি। বিশ্ব ইতিহাসে এ বিভক্তির হাজার হাজার বা লাখ লাখ ঘটনার দৃষ্টান্ত যে রয়েছে তা নয়, কোটি কোটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। দুটি মহাযুদ্ধে কোটি কোটি লোক জীবন দিল। এই দুটি যুদ্ধ মুসলমানদের বিভক্তির কারণে বাধেনি, দুটি যুদ্ধের প্রধান উদ্যোক্তাদের সকলেই ছিলেন খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাসী। বিভক্তি তো বিশ্বের যে কোনো ধর্ম বিশ্বাসীদের প্রায় প্রতিটি পরিবারে দেখা যায়। এত কিছুর পরও মুসলমানরা অনৈক্যের এই ময়দানে দ্বীনের পতাকা উড্ডীন করে সরাসরি অর্ধ শতাধিক দেশ শাসন করছে।

যা হোক, মানব প্রকৃতির মধ্যেই যখন বিভক্তির সংঘাত-সংঘর্ষ চলছে, তখন মুসলমানরা মানব প্রকৃতির ধারায় ব্যতিক্রম তো হতে পারে না, তবে বিভক্তিকে ঐক্যে পরিণত করার যে ফর্মুলা আল্লাহ পাক দিয়েছেন, তা মুসলমানরা মান্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও মানছে না। তাই মুসলমানদের বিভক্তি বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে। মুসলমানদের মধ্যে স্বজন দুশমন হওয়ার কারণ এটাই। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, আহমদ শরীফ ও সরদার আলাউদ্দিনরা বিদ্রোহী গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। স্বজন হয়েও ওরা হয়েছে দুশমন, ইবলিস হয়েছে বা হয়েছিল তাদের পথ প্রদর্শক ও গাইড।

www.nagorikpathagar.org

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

জনাব আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীকে আমি এখনও মুসলিম মিল্লাতের একজন স্বজন বলে মনে করি। তিনি যদিও ১৯৭৫ সালের পর থেকে অব্যাহতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুশমনের ভূমিকা পালন করে আসছেন। এই তিক্ত মন্তব্য করলাম অকারণে নয় বরং কারণে। 'কারণ'-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে এ আলোচনায়।

মুসলমান হয়ে ইসলাম আর মুসলিম মিল্লাতকে খোঁচা দেয়া, আঘাত করা, দু'চারটা গালি দেয়া, মুসলমানের দোষ-ত্রুটি চিহ্নিত করে কলমবাজি করা হলো বামপন্থী, তথাকথিত প্রগতিবাদী ও অসাম্প্রদায়িক হওয়ার এলার্জিগ্রস্তদের বাতিক বিশেষ। আজকাল এ মানসিকতা অনেকেই লালন করছেন। জনাব আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীও এই মানসিকতার মানুষ সেজেছেন।

তিনি ইসলাম আর মুসলমানের সমালোচনা করে থাকেন নিয়মিত। যতই তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, ততই তাঁর মধ্যে মুসলমানকে গালি দেয়ার তেজ বাড়ছে। এতদসত্ত্বেও আমি বলবো, তিনি নাস্তিক নন, মুরতাদ নন, যদিও তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনের জঘন্যতম দিগম্বরী পতিতা তসলিমা নাসরিনের জীবন-দর্শনের একজন কট্টর সমর্থক। হ্যাঁ, তিনি যে সুবিধাবাদী একজন সেকুলারিস্ট, তা কিন্তু আমি না বলে পারছি না। তাঁর বৈষয়িক চিন্তা একান্তভাবে আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক। সামান্য কারণে তার জীবন-কম্পাসের কাঁটা বিপরীত দিকে ঘুরে যায়। যেখানে স্বার্থ নেই, সেখানে তিনি নেই। স্বার্থ আছে যেখানে, জনাব চৌধুরী আছেন সেখানে। এ জন্য তিনি স্বার্থের হাওয়া বুঝে দিক পরিবর্তন করেন। তবে এ কথা সত্য যে, ১৯৭৫ সালের আগে আমি তাঁকে মুসলিম বিরোধী ভূমিকা পালনে দেখিনি। তাই বলে তিনি যে মুসলমানদের একজন প্রিয় স্বজন ছিলেন, এ কথাও আমি বলছি না।

বরিশাল জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ (১৯৩৪)

www.nagorikpathagar.org

করেন। মুসলিম ঐতিহ্য-পরিবেশে তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। সে কারণে তিনি ধর্মীয় শিক্ষাও কিছুটা লাভ করেন। তাঁর আকিকা, খতনা ও বিবাহ ইসলামী বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় দেখেছি, জনাব চৌধুরীর লেখনী মুসলমানদের পক্ষে শাণিত তলোয়ার হিসাবে স্বজনের ভূমিকা পালনে ব্যবহৃত হতে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্টের পূর্ব পর্যন্ত আমরা তাঁর হাতে যে কলম দেখেছি, সে কলম ছিল অসত্যের বিরুদ্ধে এক চাবুকের মত। সে সময়ের তাঁর সাহসী কলমের আবাদ করা অনেক ফসল আজও আমি সযত্নে ধরে রেখেছি। আওয়ামী লীগের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হয়েও তিনি তাঁর প্রিয় দলের নীতি ও কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করেছেন। কোন কোন বিষয়ের বা ইস্যুর ওপর তিনি সাহসী প্রতিবাদী লেখা লিখেছেন, যা সে সময়ে ও সে পরিবেশে এমন কঠোর ভাষায় সমালোচনা করার মত সাহসী লোক সারা দেশে মাত্র ৫/৭ জনের বেশি ছিলেন না। সত্য প্রকাশে সাহসী এই ব্যক্তিটি ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্টের পর হয়ে গেলেন অন্য মানুষ। দেশ ছেড়ে তিনি বিদেশে পাড়ি জমালেন। বিলেতে আশ্রয় নিলেন। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব আহমদ মুসার মন্তব্য ছিল এই, (দৈনিক দিনকাল ১৯/১/৯৩) "তিনি (আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী) শেখ মুজিবুর রহমানের কথা বিলেতে কাতর স্বরে বলতেন আর সিলেটিদের মন গলাতেন। দেশে ফিরে গেলে তাঁর বিপদ হতে পারে, এ কারণ দেখিয়ে লন্ডনে 'পলিটিক্যাল এসাইলাম' চাইলেন, পেয়েও গেলেন। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে দেশ থেকে তাঁর দুই মেয়ে ও এক পুত্রকেও নিয়ে গেলেন। তারপর একদিন লন্ডনে ইন্ডিয়ান দূতাবাস থেকে গাফ্ফার চৌধুরীর কাছে এক সুখবর এলো। গাফ্ফার চৌধুরী গেলেন ইন্ডিয়ান দূতাবাসে। প্রথম কিস্তিতে পেলেন নগদ পাঁচ হাজার পাউন্ড আর দিল্লি থেকে পাঠানো শেখ হাসিনার ছোট্ট একটি চিঠি।"

১৯৭৫ সালে দেশ ছাড়ার ১৮ বছর পর ১৯৯৩ সালের ৫ই জানুয়ারি তিনি স্ত্রী এবং এক কন্যাসহ বাংলাদেশে আসেন। দেশে কিছু দিন ছিলেন। তিনি তাঁর চিন্তাধারার কাছাকাছি বিভিন্ন পত্রিকায় অনেক লেখা ছাপিয়েছেন, সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন, ঢাকায় তিনি লাল গালিচা সংবর্ধনা পাবেন, কিন্তু পাননি। হতাশ হয়েছেন, ক্ষোভও নাকি প্রকাশ করেছেন। যখন বুঝতে পারলেন যে, অনাদরের মাত্রা বাড়ছে, তখন সময়ের আগেই বিলেতে ফিরে গেলেন।

১৯৭৫ সালের পর থেকে তিনি বিলেতবাসী হয়েও কলম বন্ধ করেননি। ঘাদানিপন্থী কাগজগুলোতে নিয়মিত লিখতেন এবং এখনও লিখেন। ১৯৭৫-এর

www.nagorikpathagar.org

পর থেকে তিনি যে সব বিষয়ের ওপর সবচেয়ে বেশি লেখালেখি করেন, তাহলো ইসলাম, মুসলমান, ইসলামের ইতিহাস, মুসলিম রাজনীতি, পাকিস্তান, মুসলিম দেশ, মধ্যপ্রাচ্যের দেশ, বাংলাদেশের রাজনীতি, তসলিমা, বামপন্থী রাজনীতি, ইসলামপন্থী দলসমূহ, ঘাদানি প্রশস্তি ইত্যাদি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলাম আর মুসলমানদের ওপর আঘাত করেই লেখালেখি করে থাকেন। আমি এসব মন্তব্য করিনি অনুমানের ওপর ভিত্তি করে। প্রমাণ আছে আমার ফাইলে। ১৯৭৫ থেকে এ পর্যন্ত তিনি ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে যত লিখেছেন, সে সব লেখার জবাব দিতে হলে কয়েকখানা পুস্তক রচনার প্রয়োজন। সে পদক্ষেপ নেব না এবং এমন ইচ্ছাও রাখি না। এখানে আমি তাঁর একটি মাত্র লেখার ওপর আলোচনা করছি। যে লেখাটি ১৯৯২ সালের ১০ই এপ্রিল ঢাকার একটি বাংলা দৈনিকে ছাপা হয়।

দৈনিকটিতে প্রকাশিত (১০ই এপ্রিল ১৯৯২) তাঁর 'তৃতীয় মত' শিরোনামের লেখায় প্রথমে তিনি ইসলামের প্রতি যথেষ্ট দরদ দেখিয়েছেন। তারপর ধীরে ধীরে পঞ্চম বাহিনীর পাকা লোকের মত ইসলামের সীমানায় প্রবেশ করে মুখোশ খুলে খোলাফায়ে রাশেদা, উমাইয়া আমল, আব্বাসীয়া আমল, কারবালা, শিয়া-সুন্নী ঝগড়া, মুসলমান-কাদিয়ানী দাঙ্গা, ব্রিটিশ আমলে উপমহাদেশের রাজনীতি, ইরান, ইরাক, লিবিয়া, সাদ্দাম হোসেন, মোয়াম্মার গাদ্দাফী, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ, সৌদী আরব, রোহিঙ্গা সমস্যা এবং তথাকথিত গণআদালত প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করে যেমন খুশি তেমন গালিগালাজ করেছেন। তাঁর বে-নেকাব গালাগালির মূল টার্গেটি যে ইসলাম, তা বেশ বুঝা যায়। তিনি পাঠককে বুঝাতে চেয়েছেন, এই বিশ্বে যত মারামারি, কাটাকাটি, খুনাখুনি, ঝগড়া-ফ্যাসাদ আর রক্তারক্তি হয়, সবই হয় মুসলমানদের মধ্যে। তিনি বলেছেন, তিনজন খলিফাকে হত্যা করেছে মুসলমানরা। আব্বাসীয় ও উমাইয়া বংশের ইতিহাস হচ্ছে নৃশংসতার ইতিহাস। ইসলাম যেখানে আছে, সেখানেই খুন আর বিরোধ। সৌদি আরব বিশ্বের সব জায়গায় গোলমাল লাগায়। রোহিঙ্গা সংকটও সৌদি আরব সৃষ্টি করেছে। লন্ডনের কোন এক ইহুদি কাগজে নাকি তাই লিখেছে, তিনি তা বিশ্বাস করেছেন।

'তৃতীয় মত'-এর লেখক, এ কথার মানে তিনি এ পক্ষেও নেই ঐ পক্ষেও নেই, আছেন গ্যালারিতে, নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে। বাংলাদেশের মাঠে রাজনীতির যে খেলা হচ্ছে তা তিনি বিলেতের গ্যালারিতে বসে ইহুদি-খ্রিস্টানদের দূরবীন চোখে লাগিয়ে নিজের মানসিকতা তাতে যোগ করে দেখছেন, আর মাঝে মাঝে কমেন্টেটর হয়ে কমেন্ট করছেন। অভাব পূরণের গায়েবী চ্যানেল থাকলে কত

www.nagorikpathagar.org

রকমের ঢেকুর দেয়া যায়, তবে হজমের প্রক্রিয়ায় কখনো কখনো বদহজমও হয়।

মুসলিম ইতিহাসের কোন পুরানো অধ্যায় বা বর্তমান বিশ্ব মুসলিমের চলমান কোন ঘটনার গঠনমূলক দরদী আলোচনা একমাত্র তিনিই করতে পারেন, যিনি ইসলামী আমল ও ঈমান নিয়ে চলেন। অর্থাৎ এমন যার চরিত্র, তিনি স্বজাতিকে ভালোবেসে সমালোচনা করেন। এ সমালোচনায় থাকে দরদ। যার মধ্যে ইসলামের সেই চরিত্র নেই, তাঁর সমালোচনা হয় পক্ষপাতদুষ্ট। এক কথায় বলা যায়, তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত আক্রমণ। কিন্তু যাদের ঈমান আর চরিত্র ইসলামী চেতনা বিরোধী, সেক্যুলারিস্ট হয়ে জীবন-যাপন করাকে যিনি মনে করেন গর্ব, বছরে একবার ঈদের নামাজ আদায় অথবা বড়জোর সপ্তাহে একবার জুমার নামাজে মাত্র দু'রাকাতের জন্য হাজিরা দিয়ে মনে করেন ইসলামকে ধন্য করলেন, এমন যিনি বা যারা, তিনি বা তারা সময়-সুযোগ পেলেই ইসলাম আর মুসলমান্দের গালি দেন আর নিজেদের 'মহান মুসলমান' বলে জাহির করার চেষ্টা করেন। তারা নিজেদের মুসলিম পরিচয় ত্যাগও করতে পারেন না নানা সামাজিক ও বৈষয়িক কারণে। নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়ে দিন যাপনও করেন না ধর্মান্ধ, মৌলবাদী বা অপ্রগতিবাদী হওয়ার ভয়ে। প্রবাসী এই চৌধুরী সাহেব সে সেই গোত্রের মুসলমান বলে আমি মনে করি। ঢাকায় থাকাকালীন তাঁকে সুবিধাবাদী মুসলমান হিসাবে দেখেছি। ঘন ঘন দিক পরিবর্তনে পারঙ্গম এই ওস্তাদ ব্যক্তিটিকে এখন একটি ক্ষেত্রে দেখেছি স্থির আর সেই ক্ষেত্রটি হচ্ছে, 'ইসলাম আর মুসলমানদের গালাগালি করার ক্ষেত্রে'।

প্রবাসী লেখক নিরাপদ দূরের গ্যালারিতে বসে লিখেছেন, 'ইসলামের দেড় হাজার বছরের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, আত্মঘাতী বিরোধ, রক্তপাত এবং অনৈক্য ছাড়া মুসলমানদের ইতিহাসে শান্তি ও ঐক্যের নজির পাওয়া যায়নি। প্রথম যুগের চার খলিফার মধ্যে তিনজনই নিহত হন মুসলমান ঘাতকের হাতে।'

ধন্যবাদ জানাই লেখককে। তিনি ইসলামের দেড় হাজার বছরের ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করার তো তকলিফ করেছেন। আমি অবশ্য এ প্রশ্ন তাঁকে করছি না যে, চৌধুরী সাহেব, যে সব ইতিহাস আপনি ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন, সে সব ইতিহাসের লেখক কারা ছিলেন? নিশ্চয়ই মুসলিম বিদ্বেষী খ্রিস্টান লেখকরা হবেন। আফসোস! ইসলামের এই দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে তিনি শুধু আত্মঘাতী বিরোধ আর রক্তপাত ছাড়া আর কিছুই পাননি। ইসলামের ইতিহাসে মহানুভবতা, বিশ্ব মানবিকতা, বিশ্ব সভ্যতায় ইসলামের অবদান, সাম্য-মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা, নারীর মর্যাদা দান, দাস প্রথার

www.nagorikpathagar.org

বিলুপ্তিসহ অসংখ্য অবদান ও উজ্জ্বল ঘটনার তিনি সন্ধান পাননি। তিনি যে অভিজাত হয়েছেন 'চৌধুরী' পদবী গ্রহণ করে (যদিও এ পদবী বংশ পরম্পরায় গ্রহণ করার কোন ভিত্তি ও যৌক্তিকতা নেই) তাও যে মুসলমান শাসকদের বদৌলতে পেয়ে জাতে উঠেছেন, এটাও কি ভুলে গেলেন? তিনি ইসলামের ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন ইসলামকে ঘায়েল করার মত কিছু পাওয়া যায় কিনা সেই মানসিকতা ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে। যে নিয়তে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন, তাই তিনি পেয়েছেন। নিরপেক্ষ নিয়ত নিয়ে অথবা ইসলাম আর মুসলমান প্রীতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে মন্দের চেয়ে অনেক অনেক বেশি ভালো জিনিস তিনি আহরণ করতে পারতেন। কিন্তু সেই নিয়ত তাঁর ছিল না। তাই নিয়ত মুতাবেক তাঁর মওজুদ গড়ে উঠেছে। মানুষের মধ্যে তালাশ করলে পাওয়া যায় বিবেক, জ্ঞান, শিক্ষা ও উদারতা। কিন্তু এসব যদি তালাশ না করে কেউ মানুষের মধ্যে শুধু রোগ-জীবাণু তালাশ করে, তাহলে তাও পাওয়া যাবে। সুতরাং লক্ষ্য আর নিয়তের হেরফেরের কারণে আহরণেও হেরফের হয়।

'প্রথম যুগের চার খলিফার মধ্যে তিনজনকেই হত্যা করা হয়েছে'-এ কথা দ্বারা লেখক ইসলাম আর মুসলমানদের কোন্ দোষটা প্রমাণ করতে চান? তিনি দাবি করেছেন, ইসলামের দেড় হাজার বছরের ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। তিনি কি ঘাঁটাঘাঁটি করলেন তা বুঝলাম না। শুধু ইসলামের পেশাব-পায়খানাই ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন বলে মনে হয়। ইসলামের সঠিক ইতিহাস উদার মনে ঘাঁটাঘাঁটি করলে দেখতে পেতেন যে, এই তিন খলিফার কোন একজনও মুসলমানের হাতে নিহত হননি। *হযরত ওমর (রাঃ)-এর হত্যাকারী ছিল আবু লুলু ফিরোজ নামের এক অগ্নি উপাসক ক্রীতদাস। যার বাড়ি ছিল ইরানে। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যাকারী ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারী, ছদ্মবেশী ইহুদি। হযরত আলী (রাঃ)-এর হত্যাকারী ছিল ইবনে মুলআন নামের এক মুরতাদ।* ইসলামের দেড় হাজার বছরের ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটি করে নিবন্ধকার এই ঘাতকদের নাম আর পরিচিতিও কি জানতে পারেননি? মুসলমানদের 'আত্মঘাতী বিরোধ আর রক্তপাত'-এর প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনার মূলে মুরতাদরা যে সক্রিয় থাকে, তা কি লেখককে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে? ব্যাখ্যায় গেলে লেখক লজ্জা পাবেন এবং নিজের মুখোশও খসে পড়তে পারে।

জনাব আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, আহমদ শরীফ, দাউদ হায়দার, তসলিমা, সুফিয়া কামাল এবং জাহানারা ইমাম যে ভূমিকা পালন করেছেন, ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে অনুরূপ চরিত্রের নরনারী একই ভূমিকা পালন করে ইসলামের পিঠে ছুরিকাঘাত করেছে, গোলমাল বাঁধিয়েছে, রক্তপাত ঘটিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

চার খলিফার তিন খলিফা অমুসলিমদের হাতে নিহত হওয়া সত্ত্বেও প্রবাসী লেখক ইসলামের ইতিহাসকে আত্মঘাতী বিরোধ ও রক্তপাতের ইতিহাস বলার আস্পর্ধা দেখিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, মুসলমানরা খুন-খারাবীকেই ভালোবাসে, শান্তি-শৃঙ্খলা চায় না। তর্কের খাতিরে না হয় তাই মেনে নিলাম কিছুক্ষণের জন্য। তারপর লেখককে জিজ্ঞাসা করি, তিনি এমন একটা ধর্মের নাম বলুন, যে ধর্মের অনুসারীরা কখনো খুন-খারাবি করেনি, শান্তিতে দিন যাপন করেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রিস্টান, কার কথা বলবেন? এসব জাতির ইতিহাস কি ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন? বোধহয় করেননি। করে থাকলেও জ্ঞাত কারণে মুখ খুলবেন না। 'স্বজন যখন দুশমন হয়' এই শিরোনামের প্রথম প্রবন্ধটি পাঠ করুন। অতঃপর কথা বলুন। সভ্য দেশ বলে কথিত আমেরিকার ইতিহাসটা কি তিনি ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন? যদি করে থাকেন, তাহলে জর্জ ওয়াশিংটন থেকে বর্তমান প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন পর্যন্ত দীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে তিনি রক্তের কোন দাগ কি প্রত্যক্ষ করেননি? ১৭৮৯ সাল থেকে যে দেশের সভ্যতা শুরু, (আমেরিকার সভ্যতা আধুনিক সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত) মাত্র ২১০/২১১ বছরের মধ্যে কত প্রেসিডেন্ট প্রাণ হারিয়েছেন, আহত হয়েছেন, কত খুন-খারাবি সে দেশে ঘটেছে এবং এখনও সে দেশে সভ্যতা বিনাশী কি কি কারবার চলছে, তা লেখকের তো জানা থাকার কথা।

পণ্ডিতদের কোন কোন অজ্ঞতা শুধু লজ্জাজনক নয়, দুঃখজনকও বটে। ইসলামের প্রথম চার খলিফার মধ্যে তিন খলিফা অমুসলিমদের হাতে নিহত হওয়ার কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও চৌধুরী সাহেবরা হত্যার অপবাদটা মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে খ্রিস্টানদের ইতিহাসকে বোধহয় আত্মঘাতি কলহ এবং রক্তপাত থেকে মুক্ত প্রমাণ করতে চান। চৌধুরী সাহেবদের ভাষায় মধ্যযুগ অর্থাৎ মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল শাসনামল বর্বরতার যুগ এবং আত্মঘাতি কলহ এবং খুন-খারাবীর যুগ। সাংস্কৃতিক দাসত্ব বোধহয় একেই বলে!

আমেরিকার সদর-অন্দর : প্রথমে আমেরিকার কথা ধরা যাক। আমেরিকাকে আধুনিক বিশ্বের একটি সুসভ্য দেশ বলা হয়। এ দেশের শাসকদের প্রত্যেকেই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। চৌধুরী সাহেবরা আমেরিকাকে বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ বলে অভিহিত করে থাকেন। তারা বলেন, আমেরিকা হচ্ছে ন্যায়-নীতির দেশ, সভ্যতা-সংস্কৃতির দেশ, অত্যাধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞানের দেশ, সর্বোত্তম আইন-কানুনের দেশ, মানবতাবাদী দেশ এবং পৃথিবীর এক নম্বর সাহায্যদাতা দেশ। এই আমেরিকা বা যুক্তরাষ্ট্রে জর্জ ওয়াশিংটন থেকে শুরু করে সাবেক প্রেসিডেন্ট রিগ্যান পর্যন্ত ৪০ জন প্রেসিডেন্ট দেশ শাসন করেছেন। মিঃ

www.nagorikpathagar.org

বুশ ছিলেন একচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট আর বিল ক্লিনটন হচ্ছেন বিয়াল্লিশতম। এই 'সুসভ্য দেশ' 'সুসভ্য' খ্রিস্টান জাতির বাস। তারা নাকি আত্মঘাতি কলহ ও রক্তপাতের উর্ধ্বে। কিন্তু এত কড়া আইন-কানুন আর মজবুত নিরাপত্তার দেশে বন্দুকই মার্কিন ইতিহাসের পট পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একথা কি চৌধুরী সাহেবরা জানেন না? যুক্তরাষ্ট্রের বেয়াল্লিশ জন প্রেসিডেন্টের মধ্যে চারজন নিহত হয়েছেন বন্দুকের গুলিতে স্বধর্মাবলম্বী খ্রিস্টানদের হাতে। এরা হলেন আব্রাহাম লিংকন (শাসনকাল উল্লেখ করা হলো) (৪ঠা মার্চ ১৮৬১-১৫ই এপ্রিল ১৮৬৫), জেমস আবব্রাম গারফিল্ড (৪ঠা মার্চ ১৮৮১-১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৮১), উইলিয়াম মেক্‌কিন্‌লে (৪ঠা মার্চ ১৮৯৭-১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯০১) এবং জন এফ কেনেডি (২০শে জানুয়ারি ১৯৬১-২২শে নভেম্বর ১৯৬৩)।

১৯৮১ সালের ৩০শে মার্চ প্রেসিডেন্ট রিগ্যানকে হত্যার চেষ্টা চালানো হয় বন্দুকের সাহায্যে। কিন্তু তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পান। প্রেসিডেন্ট রিগ্যান একবার তাঁর পত্নীর জন্য একটি বন্দুক কিনেছিলেন। তিনি যখন নির্বাচনী প্রচার অভিযানে বের হতেন, তখন নেন্সি শয্যা পার্শ্বে বন্দুকটি রাখতেন। ১৯৫০ সালে প্রেসিডেন্ট হ্যারী এস ট্রুমেন জনৈক পুয়ের্টোরিক্যান জাতীয়তাবাদীর গুলি থেকে প্রাণে বেঁচে যান। ১৯৩৩ সালে প্রেসিডেন্ট পদে অভিষেকের সময় আততায়ীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পান ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট। ১৯৭৫ সালে প্রেসিডেন্ট ফোর্ডকে দু'বার হত্যার চেষ্টা করা হয়। অতীতে শত শত মার্কিন নেতা ও লাখ লাখ মার্কিন নাগরিকের হত্যায় বন্দুক ব্যবহার করা হয়েছে। নাগরিক অধিকারের নেতা কিং মার্টিন লুথার এই বন্দুকের গুলিতেই নিহত হয়েছেন ১৯৬৮ সালে। জন কেনেডির ভ্রাতা রবার্ট কেনেডি নিহত হন ১৯৬৮ সালে বন্দুকের গুলিতেই।

১৯৮১ সালে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গড়ে প্রতিদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬২ জন নাগরিক বুলেটবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। শুধু ১৯৮০ সালে এক বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুকের গুলিতে নিহত হওয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ ১৭ হাজার। ভিয়েতনাম যুদ্ধে যে পরিমাণ মার্কিন সৈন্য নিহত হয়, এ সংখ্যা তার চারগুণ। যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলগুলোতে কমপক্ষে ২৫ লাখ আমেরিকান কিশোর পিস্তল, ছুরি, ক্ষুর ও মুগুর জাতীয় অস্ত্র বহন করে নিয়ে যায়। এ খবর পরিবেশন করেছে রয়টার ১৯৯১ সালের ১৭ই নভেম্বর। আমেরিকার সমাজ বিজ্ঞানী, মনস্তত্ববিদ এবং অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, সামাজিক সমস্যা কিশোরদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে।

তাদের অভিমত : (১) পারিবারিক নির্যাতন : কিশোর ও নাবালকদের প্রতি

www.nagorikpathagar.org

পরিবারের সদস্যদের ঔদাসিন্য, তাদের গাল-মন্দ বা মারধর করা। ১৯৮০-৮৭ সালের মধ্যে এই নির্যাতন ১২ লাখ থেকে ২২ লাখে এসে দাঁড়ায়। (২) দরিদ্রতা : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচটি শিশু-কিশোরের মধ্যে ১ জন দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। (৩) সঙ্গী-সাথীদের প্রভাব : শিশু-কিশোর তাদের পিতা-মাতা, গুরুজন ও শিক্ষকদের চাইতে সঙ্গী-সাথীদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। (৪) অসম্পূর্ণ শিক্ষা জীবন : শতকরা ২৫ জন পড়াশোনা শেষ করার আগেই স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে। (৫) অভিভাবকদের গৃহে অনুপস্থিতি : জীবিকার কারণে ৫৪ থেকে ৬৫ শতাংশ অভিভাবক গৃহে অনুপস্থিত থাকেন। বর্তমানে ২৪ শতাংশ কিশোর একক অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণে থাকে। (৬) মাদকদ্রব্য : মাদকদ্রব্য সেবনের হার বেড়ে যাওয়ার কারণে সামাজিক অবক্ষয় বাড়ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে অপরাধের কারণগুলো হচ্ছে : অভিভাবকদের দায়িত্বহীনতা শতকরা ৭২, আদালতে কিশোর অপরাধীদের প্রতি দুর্ব্যবহার ৭০, অভিভাবকদের দুর্ব্যবহার ৬৭, চলচ্চিত্র এবং টিভিতে অতিরিক্ত মারদাঙ্গা এবং যৌনতা ৬৭, বিজ্ঞাপনে যৌন আবেদন ৫৭, রক সঙ্গীতে যৌনতা এবং মারদাঙ্গার আবেদন, দরিদ্রতার কারণে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া ৫০ শতাংশ, অপর্যাপ্ত বিনোদনের অভাব ৪২, পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাব ৩৮ শতাংশ। এ কারণগুলো কিশোরদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ অভিমত হচ্ছে মার্কিন সমাজ বিজ্ঞানীদের (১৫/৬/৮৯)।

১৯৮৪ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে শুধু আগ্নেয়াস্ত্রে কিশোরদের মৃত্যুর সংখ্যা আগের চার বছরের মৃত্যুর সংখ্যার অনুপাতে চল্লিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধ বিজ্ঞানীরা হিসাব কষে দেখেছেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর হারের চেয়ে গুলিতে মৃত্যুর হার ১১ শতাংশ বেশি। এ জন্য নিউইয়র্কের ছাত্রদের অনেকে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরিধান করে ক্লাসে যায়। ১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাসে রয়টার পরিবেশিত খবর ছিল এই : যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৬ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হয়। ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি শহরে যে সব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তার পরিসংখ্যান হচ্ছে এই : নিউইয়র্কে ২২০০, লসএঞ্জেলসে ৯৫৯, হিউস্টনে ৬১৬, ফিলাডেলফিয়ায় ৫১২ এবং ওয়াশিংটনে ৪৩০। অন্যান্য শহরের হত্যাকাণ্ডের পরিসংখ্যান এখানে উল্লেখ করলাম না।

রয়টার পরিবেশিত ২৪/৪/৯২ তারিখের খবর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন প্রায় ১৯শ' মহিলা ধর্ষণের শিকার হয়। প্রতি বছর এ সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৯১ সালে ২ লাখ ৭ হাজার ৬১০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯০ সালের তুলনায় ১৯৯২ সালে ৫৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসের খবর :

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকায় ২ কোটি আমেরিকান পুরুষত্বহীন। ১ কোটি লোককে চিকিৎসা করলেও ভালো হবে না। ১ লাখ লোক মাতাল অবস্থায় মারা যায়। ১ কোটি লোক হাঁপানী রোগী। সমকামীর সংখ্যা বেশুমার। ১৯৯০ সালে ৫ লাখ সমকামী মিছিল করেছে নিউইয়র্কে। ২০ লাখ লোক মারিজুয়ানা আর ৫ লাখ হেরোইনসেবী। ১৯৯৪ সালের ২০শে জুলাই ইউএসআই-এর পরিবেশিত খবর ছিল এই, আমেরিকায় প্রতি ১৫ সেকেন্ডে একজন মহিলা নির্যাতিত হয়। প্রতি বছর ২০ লাখ থেকে ৪০ লাখ মহিলা তাদের সঙ্গীদের দ্বারা নির্যাতিত হন।

আমেরিকায় পারিবারিক আত্মকলহে হত্যাকাণ্ড, যৌন কেলেংকারির কারণে হত্যাকাণ্ড আর বিভিন্ন কারণে হত্যাকাণ্ডের যত ঘটনা ঘটে, তা এই পুস্তকে সংকুলান সম্ভব নয়, তবু সংক্ষেপে কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। ওয়াশিংটন থেকে ২রা জুলাই ১৯৮২ সালে রয়টার পরিবেশিত খবর ছিল এই, মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদের বিরুদ্ধে যৌন কেলেংকারির অভিযোগ প্রচুর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর (এফবিআই) খবর হলো এই, কয়েকজন কংগ্রেস সদস্যের বিরুদ্ধে বিশ বছরের কম বয়স্ক কংগ্রেস বার্তাবাহক ভৃত্য তরুণ-তরুণীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ রেকর্ড করা হয়েছে। তারা উক্ত তরুণ-তরুণীদের উপহার প্রদান এবং চাকরিতে পদোন্নতির লোভ দেখিয়ে তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে প্ররোচিত করে থাকেন। সিবিএস টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারী এক ভৃত্য জানিয়েছে, অনেক কংগ্রেস সদস্য ভৃত্যদের কোকেনসহ বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য পান করিয়ে থাকেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৬ সালে প্রতিনিধি পরিষদ সদস্য ওয়েন ছিলেন হেসের সেক্রেটারি। তিনি নিয়মিত মিঃ হেসের বাড়িতে যেতেন এবং মাসিক বেতনের বিনিময়ে তাঁকে দেহ দান করতেন। এ কারণে তাকে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের যৌন কেলেংকারি তো সর্বজনবিদিত এবং বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

চৌধুরী সাহেবদের স্বপ্নের দেশ আমেরিকার আরো কিছু খবর এখানে আমি পরিবেশন করছি। নিউইয়র্ক থেকে ১৯৮২ সালের ৩০শে নভেম্বর রয়টার পরিবেশিত খবর হচ্ছে এই, ১৬ বছর বয়সে পদার্পণের আগেই সে দেশের মেয়েদের কুমারীত্ব লোপের সংখ্যা বাড়ছে। অন্যদিকে তরুণী ভার্যাদের অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্ভোগের হারও আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। প্লেবয় ম্যাগাজিন তরুণ পাঠকদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করেছে। নির্ধারিত ১৩৩টি প্রশ্নের জবাব পাঠিয়েছে ম্যাগাজিনের ৮০ হাজার পাঠক, যাদের শতকরা ৮৯ ভাগ পুরুষ। জরিপে বলা হয়, ২১ বছরের নিচের শতকরা

www.nagorikpathagar.org

৫৮ ভাগ মেয়ে ১৬ বছর বয়সে পৌঁছার আগেই যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে একই বয়সের ছেলেদের যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হওয়ার হার হলো ৩৮ ভাগ।

২১ থেকে ২৯ বছর বয়স্কা বিবাহিতা মেয়েদের শতকরা ৩৫ ভাগ পর পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হওয়ার কথা স্বীকৃত। একই বয়সের বিবাহিত পুরুষরা অন্য নারীর সঙ্গে সহবাসের হার শতকরা ২৫ ভাগ। আজকাল এসব সংবাদে সভ্য জগত বিচলিত হয় না বা অবাকও হয় না। অথচ সমাজের ভিত ধসে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র আজ সভ্য দেশের তালিকার শীর্ষে রয়েছে। ফেডারেল সরকারের হিসেব মতে, জারজ সন্তানের সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুতহারে বাড়ছে। এই বৃদ্ধি অব্যাহত, বাড়ছে বৈ কমছে না। সত্তর দশকের শেষ দিকে এই সংখ্যা ছিল শতকরা ৪০ ভাগ। প্রতি ৬ জনে একজনের জন্ম হয় বিবাহ বন্ধনের বাইরে। ১৯৭৯ সালে ৫ লাখ ৯৭ হাজার অবৈধ সন্তানের জন্ম হয়। ১৯৭০ সালের তুলনায় এ সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ বেড়েছে। ১৯৯৩ সালে তা ৮০ ভাগে গিয়ে দাঁড়ায়। দেশব্যাপী শ্বেতাঙ্গ কুমারীদের এক-তৃতীয়াংশের এবং কৃষ্ণাঙ্গ তরুণীদের শতকরা ৮৩ জনের রয়েছে অবৈধ সন্তান। জন্স হপকিন্স বিশ্ববদ্যালয়ের এক জরিপে দেখা যায়, শতকরা ১৪ ভাগ কুমারী প্রথম সঙ্গমের আগে জন্ম নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ নেয়। কোন কোন মেয়ে অবৈধ সন্তানের মা হওয়াকে পূর্ণতা প্রাপ্তিলাভ বলে মনে করে।

যৌনাচার, মাদকদ্রব্য সেবন এবং এলকোহলের প্রচুর ব্যবহারজনিত কারণে প্রায় ২ কোটির অধিক আমেরিকান পুরুষত্বহীনতায় আক্রান্ত। এছাড়া আরো লাখ লাখ পুরুষ প্রায়ই এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন, এ খবরও রয়টার পরিবেশন করেছে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে। যৌন সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণার একজন অগ্রদূত ডাঃ উইলিয়াম মাস্টারস স্বাস্থ্য বিষয়ক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের এক সেমিনারে এ কথা বলেন। বছরে লক্ষাধিক মার্কিন মাতাল অবস্থায় মারা যায়, এ কথা আগেই বলেছি। ১৯৮৬ সালের ১৯শে এপ্রিল এএফবি পরিবেশিত খবর হচ্ছে এই, ১০ থেকে ১১ বছর বয়স্ক লক্ষাধিক মার্কিন ছেলেমেয়ে সপ্তাহে অন্তত একবার নেশা করে এবং নয় বছর বয়স্ক শিশুদের এক-তৃতীয়াংশ মদ্যপানে আসক্ত। জাতীয় কাউন্সিল (এনসিএ) এ তথ্য প্রকাশ করে। এনসিএ জানায়, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর মাদকাসক্তির কারণে লক্ষাধিক লোক মারা যায় এবং মদজনিত বার্ষিক খরচের পরিমাণ ১৬ হাজার ৬ শত কোটি ডলার। ১৯৮৪ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ওয়াশিংটন থেকে সিনহুয়া পরিবেশিত খবর হচ্ছে এই, ১০ লাখ আমেরিকান নিয়মিত কোকেন ব্যবহার করে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

২০ লাখেরও বেশি লোক মাসে কমপক্ষে একবার মারিজুয়ানা সেবন করে এবং ৫ লাখ লোক হেরোইন ব্যবহার করে থাকে। এ জন্য বছরে ব্যয় হয় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই সভ্য আমেরিকায় যৌনাচার এতই প্রবল যে, যৌনাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমেরিকার এক শ্রেণীর ছাত্রী সহশিক্ষার বিরুদ্ধে রাজপথে ১৯৯০ সালের মে মাসে মিছিল বের করে। মেয়েদের একটি কলেজে ১৯৯১ সাল থেকে সহশিক্ষা চালু করা হবে এই সিদ্ধান্তের কথা শোনে সে কলেজের ছাত্রীরা রীতিমত বিলাপ, আর্তনাদ ও মরাকান্না জুড়ে দেয়। এ ঘটনা ঘটে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার অকল্যান্ড শহরের মিলস কলেজে। ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকা জানিয়েছে, এই কলেজ সে দেশের গোটা পশ্চিমাঞ্চলের অগ্রণী নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুপরিচিত। এই কলেজে পুরুষের অনুপ্রবেশে ক্ষুব্ধ ছাত্রীদের চিৎকারে যেন কলেজ ক্যাম্পাস ডুবে গিয়েছিল। যখন সহশিক্ষার ঘোষণা দেয়া শুরু হয়, তখন সমবেত তরুণীরা কান-ফাটা চিৎকার দিয়ে উঠে। তাদের অনেকে ক্ষোভে-দুঃখে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। ছাত্রী নেত্রীরা ১৩৮ বছরের পুরনো এই কলেজে সহশিক্ষার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বলেন, 'সহশিক্ষার চেয়ে মরণই শ্রেয়'।

চৌধুরী সাহেবদের স্বপ্নের দেশ আমেরিকার কিছু সামাজিক দিকও এখানে তুলে ধরছি। ১৯৮৭ সালের আগস্ট মাসের খবর। মার্কিন সাময়িকী ইউএস নিউজ এ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্টের একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে, আমেরিকা ক্রমেই এমন একটি দেশ হয়ে উঠছে, যেখানে লোকেরা গৃহসংস্থানসম্পন্ন ও গৃহহীন -এই দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতে শুরু করেছে। এমনকি আজও বহু মার্কিন আশ্রয় শিবির এমনসব লোকে ভরপুর, যাদের বাসা ভাড়া পরিশোধ করার ক্ষমতা নেই। এর কারণ হচ্ছে এই, বিগত দশ বছরে বহু ব্যবসায়ী পুরাতন বাড়িঘর কিনে নিয়ে নতুন দালান কোটা তৈরি করেছেন, যেগুলোতে বাস করতো গরীব আমেরিকান। এর ফলে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত গৃহসংস্থানের ব্যয় কুলিয়ে উঠতে না পারা দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা ৮৯ লাখ থেকে ১ কোটি ১৯ লাখে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০ জনের মধ্যে একজন দাতব্য খাদ্য সংস্থার ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। এই হিসাব মতে, যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটি ৬০ লাখ লোক বুভুক্ষ। যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম খাদ্য ব্যাংক 'সেকেন্ড হার্ভেস্ট' এ তথ্য জানিয়েছে (দৈনিক ইনকিলাব ১১/৩/৯৪)।

আলো-আঁধারের দুর্যোগের ঘন-ঘটার মধ্যেও সভ্য আর অসভ্য লোকের সত্যিকার রূপ বেরিয়ে পড়ে। সভ্য আমেরিকার অসভ্য রূপটা আঁধারের মধ্যেই দেখার অনুরোধ করি চৌধুরী সাহেবদের।

www.nagorikpathagar.org

"১৯৬৫ সালের নিষ্প্রদীপ মহড়ার দুঃস্বপ্ন আর দেখতে হবে না' বলেই নিউইয়র্কবাসীর প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সভ্যতার আলোকে উজ্জ্বল এই নগরীতে ১৯৭৭ সালের ১৩ই জুলাই যে দৃশ্য সৃষ্টি হয়, তা কেবল বিস্ময়করই নয়, ভয়াবহও বটে। বৈদ্যুতিক আলোর অনুপস্থিতিতে রাতের অন্ধকারে সভ্যতার মুখোশ পরা মার্কিনরা তাদের সত্যিকার নগ্ন চেহারা-চরিত্র বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিল অত্যন্ত প্রকটভাবে।

১৯৭৭ সালের ১৩ জুলাই রাতে নিউইয়র্ক শহরে আলো ছিল না। এই সুযোগেই নগরীতে অসংখ্য চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানী, লুটপাট, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। বিদ্যুৎ না থাকায় আলো, পানি, এয়ারকুলার এবং পাখা থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ চালিত সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়।

টিভি নেটওয়ার্ক ও সংবাদ সংস্থার কাজও বন্ধ হয়ে যায়। নগরীর মেয়র আব্রাহাম বীন নিউইয়র্কে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে নগরীতে অতিরিক্ত পুলিশ ও অগ্নিনির্বাপককারী পুলিশও তলব করতে হয়। হাসপাতালগুলোতে অতিরিক্ত জেনারেটর স্থাপন করা হয় জরুরি ভিত্তিতে কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে। বিদ্যুতের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অন্ধকারে হাজার হাজার লোক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে এবং নগরীর ১৬টি এলাকায় নির্বিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে।

১৯৬৮ সালে কৃষ্ণাঙ্গ নেতা কিং মার্টিন লুথার আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর যে ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল, ঠিক প্রায় একই রকম পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে অন্ধকারাচ্ছন্ন নিউইয়র্ক শহরের ঐসব এলাকাতে। জঙ্গী রূপ ধারণ করে নারী-পুরুষ এমনকি শিশুর দল। বিভিন্ন বারে ঢুকে স্টোর রুমের কপাট ভেঙ্গে চুরমার করার পর প্লেট-গ্লাস নিয়ে যায়। এমনকি জানালা-কপাটসহ যা হাতের কাছে পায়, তা বহন করে নিয়ে যেতে থাকে। যা তারা নিতে পারেনি, তা ভেঙ্গে-চুরে একাকার করে দেয়। প্রথম দিকে কাপড়-চোপড়, টেলিভিশন, মদ ও অলংকারের দোকানগুলোতে হাত দেয়। এসব নিঃশেষ করে খাদ্যজাত দ্রব্য, বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম ও ওষুধপত্র প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি দেয়।

বেডফোর্ডের একজন পুলিশ কর্মকর্তা ফ্রাঙ্করস জানান, লুটপাটকারীদের গায়ে যেন প্রচণ্ড জ্বরের ধাক্কা লেগেছিল। তারা ট্রাক ভ্যান নিয়ে রাতের অন্ধকারে বের হয়ে পড়ে এবং যা কিছু তাতে তোলা সম্ভব হয়েছিল, তাই তারা লুটপাট

www.nagorikpathagar.org

করে গাড়িতে তুলে। ২টি বালককে ১টি মূল্যবান টেবিল নিয়ে যেতে দেখে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, এই টেবিল তোমরা কোথায় পেলে? একজন বালক সাথে সাথেই জবাব দিল, আমার মা এটা দিয়েছেন, আপনি চাইলে এটা নিয়ে যেতে পারেন। এই বলে তারা জনতার ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এ সময় জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়ে একটি সাজসরঞ্জামের দোকান ভস্মীভূত হওয়ার দৃশ্য উপভোগ করছিল।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ ফেরত এক ব্যক্তি জানান, লুটপাটের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ১৯৬৬ সালের ভিয়েতনাম পরিস্থিতির কথাই স্মরণ হচ্ছিল।

ব্রুক্স-এ এসি পন্টিয়াক শো রুমের ইস্পাতের দরজা ভেঙ্গে লুটেরারা প্রবেশ করে এবং ৫০টি গাড়ি নিয়ে যায়। এইসব গাড়ির মূল্য প্রায় আড়াই লাখ ডলার। লুটেরা যুবকেরা দল বেধে মানহাটানের পূর্ব ১৪ নং স্ট্রীটেও নেমে পড়ে। তারা মহিলাদের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। একদল ১২৫ নং স্ট্রীটে (হারলেমের) গোশতের বাজারে হানা দিয়ে ব্যাগ ভর্তি করে গোশত নিয়ে চম্পট দেয়। মাত্র ১০ বছর বয়সের ২টি বালক ১০৫ নং সড়কে ১টি টিভি নিয়ে টানাটানি করছিল। তখন অপর এক মহিলা ৩টি রেডিও সেট নিয়ে চম্পট দেয়।

পুলিশ সার্জন রবার্ট মার্ফির ভাষায়, ঐ রজনীতে পশুদের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। তিনি জানান, সবচেয়ে মজার কাণ্ড হলো, আমরা যখন টহল দিয়ে ফিরছিলাম, তখন অনেককেই বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তারা লুটপাট করছিল না বটে, কিন্তু হুইসেল বাজিয়ে লুটপাটকারীদের পুলিশের আগমন সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছিল। আমরা এক জায়গা থেকে দুষ্কৃতকারী দলকে দাবড়িয়ে দিলে তারা ধাওয়া খেয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে লুটপাট শুরু করে। এদিকে অপর একটি দল লুটপাটকারীদের ন্যায় বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ কাজে ব্যস্ত ছিল। অগ্নিনির্বাপনকারীরা ১ হাজার ৩৭টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অগ্নিনির্বাপণের চেষ্টা করে। এছাড়া ১ হাজার ৭শ'টি ভুয়া অগ্নিকাণ্ডের সংকেতও তাদের দেয়া হয়। সংকেত পেয়ে ঘটনাস্থল গিয়ে তারা মিথ্যা সংকেত দানের কথা বুঝতে পারে। সাইরেন বাজিয়ে ভিড় ঠেলে অগ্নিনির্বাপণকারী দল ঘটনাস্থলে যাওয়ার পথে দুষ্কৃতকারীরা তাদের ওপর ইট-পাথর মারতে থাকে। ঐ রাতে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে ৬৫টি ছিল খুবই মারাত্মক। একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ২২ জন অগ্নিনির্বাপক কর্মী আহত হয়। সর্বমোট আহত অগ্নিনির্বাপককারীর সংখ্যা ৫৯ জন।

একটি মাত্র ঝড় কিছুক্ষণের জন্য হলে সভ্য দেশের সভ্যতার পর্দাকে

www.nagorikpathagar.org

উন্মোচিত করে আসল চেহারা প্রদর্শন করে। ফলে দেখা যায়, সভ্যতার পর্দার আড়ালে নারকীয় কীটগুলোর কি সোল্লাস কিলবিল। এভাবে এক একটি ঝড় আসে আর পালিশ করা সভ্যতার পর্দাও সরে যায় আর তাতে দেখা যায় আসল চেহারা। চৌধুরী সাহেবরা বাংলাদেশকে সভ্য দেশ বলেন কিনা তা আমি জানি না। তবে এ দেশটিকে যে ভালবাসেন না এবং পছন্দও করেন না, তা বুঝা যায় প্রায় দু'যুগের পলাতক জীবন থেকে। এই বাংলাদেশের রাজধানীতে দিনে-রাতে কতবার যে বিদ্যুৎ থাকে না, তা অনেকটা বেহিসাবের সামিল। বিদ্যুতের অনুপস্থিতে রাতের আঁধারে সভ্য দেশ আমেরিকার মত লুটপাট অগ্নিসংযোগ আর ধর্ষণের মত তাণ্ডব সৃষ্টি হয় না এই বাংলাদেশে বা কোন মুসলিম দেশে।

পালিশ করা সভ্যতার অন্তরালে অসভ্যতার যে তাণ্ডব সৃষ্টি হয়, এমন আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। ১৯৮৩ সালের ১৮ই আগস্ট বৃহস্পতিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫ম বৃহত্তম শহর হিউস্টনে প্রচণ্ড ঝড় হয়। এই ঝড়ের সময়ে ব্যাপক লুটতরাজ চলে। লুটতরাজের অভিযোগে পুলিশ একশ' ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ঝড়ে শত শত দোকানপাটের দরজা-জানালা উড়ে যায়। সুযোগ বুঝে লুটেরারা রাস্তায় নেমে পড়ে এবং লুণ্ঠন চালায়। ১শ' কোটি ডলারের ক্ষয়ক্ষতি শুধু ঝড়ের কারণেই হয়। লুটতরাজের ক্ষয়ক্ষতি এই হিসাবের বাইরে। ঝড় শুরু হওয়ার পর রেডক্রসের ৮০টি কেন্দ্রে ২০ হাজার লোক ঘরবাড়ি ত্যাগ করে আশ্রয় নেয়। এই সুযোগেও লুটেরারা তাদের ঘরবাড়িতে লুটতরাজ করে। শহরের সকল পুলিশকে তলব করার পর লুটেরাদের নিবৃত্ত করতে কর্তৃপক্ষের ভীষণ বেগ পেতে হয়েছিল।

টেক্সাস হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য এবং হিউস্টন তারই শহর। ঘূর্ণিঝড়ে দক্ষিণ-পূর্ব টেক্সাস উপকূল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সে ঝড়ে হিউস্টন শহর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঝড়ের শুরু ও মধ্যম অবস্থায় এবং ঝড়ের শেষে তথাকার সুসভ্য নগর জীবনের যে চেহারা দেখা যায়, তাতে মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি এই চেহারা এদের সভ্যতার আসল চেহারা? ঝড়ের আগে আর ঝড় শুরু হওয়ার সময়ে চেহারায় এমন পরিবর্তন অবিশ্বাস্য মনে হলেও এই ফারাকই বাস্তব। প্রত্যেকটি ঝড় ম্যাকআপ করা সভ্যতা আর তার চাকচিক্য ও জৌলুসকে যেভাবে অপসারণ করে আসল চেহারাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে, তাতে সবক গ্রহণ করার যথেষ্ট উপাদান নিহিত আছে। বিশেষ করে যারা এই সভ্যতার রঙে রঙিন হয়ে সুসভ্য হওয়ার নিত্য মহড়া দেন, তারা এসব দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন, যদি ভালো-মন্দ বিচার করার ভেদ-বুদ্ধি লোপ পেয়ে না থাকে।

www.nagorikpathagar.org

অনুন্নত, অর্ধসভ্য এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কতবার বছরে ঝড় হয় আর সপ্তাহে কতবার বিদ্যুৎ চলে যায়, এর কোন হিসেব নেই। দু'তিন দিন পর্যন্ত বিদ্যুৎ থাকে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তথাকথিত সুসভ্য দেশের মত চৌর্যবৃত্তি, ধর্ষণ আর লুটতরাজের নাটক এসব দেশে মঞ্চস্থ হয় না। কারণ, এসব দেশের ভিতর-বাহির আলাদা করার জন্য মধ্যখানে এখনও মুখোশ-প্রাচীর গড়ে উঠেনি। কৃত্রিম আলো দিয়ে মূল চেহারার কদর্যকে কত দিনই বা ঢেকে রাখা যায়, সেই জিজ্ঞাসার জবাব কি চৌধুরী সাহেবদের থেকে পাওয়া যাবে?

ঝড়ের গতি যত বাড়বে, যতবার ঝড় হবে, ততবারই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হবে। আর ঠিক ততবারই আসল চেহারা ভেসে উঠবে। চৌধুরী সাহেবরা পশ্চিমা দুনিয়ার জাগতিক অগ্রগতি তথা রাস্তাঘাট-দালানকোঠা আর পাউন্ড-ডলারে মুগ্ধ হয়ে ভাবছেন, এটাই সভ্যতা, এটাই সুন্দর আর এটাই সত্য। এই তথাকথিত সত্যকে বরণ করতে গিয়ে নিজ জাতি-গোষ্ঠীকে গালি দেয়া একটা ফ্যাশন হিসাবে ধরে নিয়েছেন। নতুবা দেশ ছেড়ে বিদেশে এভাবে পড়ে থাকতেন না এবং প্রভুদের খুশি করার জন্য সময়ে-অসময়ে মুসলমানদের গালিগালাজ করতেন না। এই চৌধুরী সাহেব বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন এবং বাংলাদেশে কমিউনিজমের আদর্শে বাকশালী শাসন-দর্শন চালু করার ব্যাপারে অন্যতম তাত্ত্বিকের ভূমিকাও পালন করেছিলেন বলে শুনেছি। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন একটি ব্যক্তিগত কারণে। স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য তিনি মস্কো নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সোভিয়েত দূতাবাস থেকে দ্রুত ভিসা না পাওয়ায় তিনি ভীষণভাবে মেজাজ খারাপ করেন এবং নিজের কাগজে এই দুঃখের কাহিনী লিখে জাতিকে অবহিত করেন। সেই সময় থেকে সোভিয়েতের প্রতি ভিন্ন মনোভাব পোষণ করতে থাকেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সোভিয়েত প্রোফর্মার বাকশালী ব্যবস্থাকে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে হালুয়া-রুটির রেশন বন্ধ হওয়ার কারণে সাবেক প্রভুর দেশে পাড়ি দেন। আজো তিনি সেখানে আছেন। বাংলাদেশের কত বড় প্রেমিক যে তিনি, তা বেশ বুঝা যায় অকারণে পলাতক জীবন বেছে নেয়ার সিদ্ধান্তে। এমন যাদের জীবন, তাদের পক্ষে স্বধর্ম আর স্বজাতিকে গালি দেয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ, এটাই এই শ্রেণীর মানুষের চাকরি, প্রভুদের আদেশ পালন ও পালনীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

স্বপ্নের দেশ আমেরিকার অসভ্যতার আর একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে আমেরিকা প্রসঙ্গ শেষ করছি। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বরের সাপ্তাহিক নিউইয়র্ক টাইমে একটি খবর ও ছবি প্রকাশিত হয়। খবরটি হচ্ছে এই-

www.nagorikpathagar.org

As a frequent, but not general practice, certain scenes in U.S.A. films are shot twice- vividly for export and vapidly for American distribution. Producers and directors prefer to deny the habit, Nonetheless, there is such a thing in Holywood films as sex for export only. তারপর পত্রিকাটি Crytough নামক একটি ছবির দু'বারের চিত্র গ্রহণের দৃশ্যের দু'টি আলোক চিত্র পাশাপাশি ছাপিয়ে দেয়। দু'টি চিত্রই শয্যাকক্ষের দৃশ্য। আমেরিকার দর্শকের জন্য যে চিত্রটি প্রদর্শনের কথা, তাতে অভিনেত্রী বস্ত্রাবৃতা অবস্থায় আছেন। কিন্তু বিদেশে রফতানির জন্য যে দৃশ্যটি নেয়া হয় সে দৃশ্যে অভিনেত্রী কালো রংয়ের এক সংকীর্ণ জাঙ্গিয়া পরিহিতা। শরীরের বাকি অংশটুকু কাপড়ের জঞ্জাল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ ধরনের বিবসনা নারী দেহের দৃশ্য বিদেশে চালান দেয়া হয়।

১৯৮৬ সালের একটি ধর্ষণ মামলা নিউইয়র্কের এক বিচারালয়ে চলছিল। বিচার চলাকালীন এক পর্যায়ে বিচারক বললেন, আমি ধর্ষণকারীকে কিভাবে দোষী সাব্যস্ত করবো, যখন সর্বত্র সেক্সের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হচ্ছে। সেক্স সর্বত্র, সেক্স পরিবেশ গোটা সমাজের পরিবেশ, এমন অবস্থা যে সমাজে বিরাজ করছে, সে সমাজে ধর্ষণকারীকে অপরাধী ভাবি কেমন করে?

অবিশ্বাস্য হারে যৌন অপরাধ আমেরিকার সমাজে বৃদ্ধি পাওয়ার মূলে বহু চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা দ্বারা যে ক'টি কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে, তাহলো টেলিভিশন আর সিনেমা। হলিউডী ছবির প্রতি ৮টির মধ্যে ১টি ছবি নির্মিত হয় ধর্ষণ ঘটনার চিত্রায়ন করে। 'ফ্রাইডে দি থার্টিয়েত' ও 'নাইট মেয়ার অন এল্‌ম স্ট্রিট'-এর নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। টেলিভিশন ও যৌনতা ছড়াচ্ছে সর্বত্র। এসবের পরিণতি আজ এই দাঁড়াচ্ছে যে, আমেরিকান সমাজের প্রায় মহিলার 'ভীতি হয়ে গেছে জীবনের বাস্তবতা' (Fear is a fact of life)। আমেরিকার অপরাধ বিজ্ঞানীরা মহিলাদের পরামর্শ দিচ্ছেন, তারা যেন রাতের বেলা শপিং করতে না যান। লাইব্রেরিতে যাতে যান দিনের কর্মব্যস্ত সময়ে। জানালা বন্ধ করে রাতে শোবার পরামর্শও দেয়া হচ্ছে। মোট কথা, মার্কিন সমাজে নারীরা অধিক হারে নির্যাতিত হচ্ছে দৈহিকভাবে এবং চরিত্রগত কারণে।

চৌধুরীদের বিবেচনায় সুসভ্য আমেরিকায় তো বর্ণদাঙ্গা হওয়ার কথা নয়, কিন্তু হয়ে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণদাঙ্গা। ১৯৬৪ থেকে '৯২ পর্যন্ত বর্ণদাঙ্গার খতিয়ান।

www.nagorikpathagar.org

১৯৬৪ : নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের নিউইয়র্ক সিটি ও রচেস্টারের হারলেম ও বেডফোর্ড-স্টাইভেস্যান্ট, নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের জার্সি সিটি, প্যাটারসন ও এলিজাবেথে এবং ফিলাডেলফিয়ায় দাঙ্গা।

১৯৬৫ : লসএঞ্জেলসের ওয়াটস সেকশন। ন্যাশনাল গার্ড তলব করা হয়। ৩৪ জন নিহত, এক হাজার ৩২ জন আহত, ৩ হাজার ৭৭৫ জন গ্রেফতার এবং ৪ কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তির ক্ষতি হয়।

১৯৬৬ : ওয়াটসে দাঙ্গা। ২ জন নিহত, ২০ জন আহত, ৪৯ জন গ্রেফতার ও ১৯টি ভবনে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

১৯৬৬ : নেব্রাস্কার ওমাহা, শিকাগো, ক্লেভেলান্ড, ওহিয়ার ডেটন, আটলান্টা ও সানফ্রান্সিকোসহ ৪৩টি নগরীতে সহিংসতা। ১১ জন নিহত, ৪শ' আহত এবং ৩ হাজার গ্রেফতার।

১৯৬৭ : নিউ জার্সির নেওয়ার্কে দাঙ্গা। ২৬ জন নিহত, দেড় হাজার আহত, ৩শ'টি অগ্নিসংযোগের ঘটনা ও এক কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন। নিউজার্সির অন্যান্য কমিউনিটিতেও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৬৭ : ডেন্টইটে দাঙ্গা। ৪৩ জন নিহত, দুই সহস্রাধিক আহত, ৭ হাজার গ্রেফতার ও ২০ কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি, ইলিনোইসের কায়রো, নর্থ ক্যারোলিনোর দুরহাম, টেনেসীর মেমফিসে এবং মেরিল্যান্ডের কেম্ব্রিজে বর্ণদাঙ্গা।

১৯৬৮ : রেভারেন্ড মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রকে হত্যার পর ১২৫টি নগরীতে সহিংসতা। ৪৬ জন নিহত, ২ হাজার ৬শ' আহত, ২১ হাজার গ্রেফতার।

১৯৮০ : মায়ামীর লিবার্টি সিটি সেকশনে দাঙ্গা। ১৮ জন নিহত, ৪শ' জনেরও বেশি আহত, ১১শ' গ্রেফতার এবং ১০ কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন।

১৯৮২ : মায়ামীর ওভারটন সেকশন। দু'জন নিহত, ২৫ জনেরও বেশি আহত ও ৩৮ জন গ্রেফতার।

১৯৮৯ : মায়ামীর ওভারটন সেকশনে দাঙ্গা শুরু হয়। ৬ জন আহত, ৩৫১ জন গ্রেফতার ও ৩০টি ভবন ভস্মীভূত। মোটর সাইকেল চালনারত একজন কৃষাঙ্গকে জনৈক পুলিশ অফিসার গুলি করে হত্যা করলে এই দাঙ্গা শুরু হয়।

১৯৯২ : লসএঞ্জেলসে বর্ণদাঙ্গা। এই দাঙ্গায় ৪৭ জন নিহত, ২ হাজার ১শ'

www.nagorikpathagar.org

১৬ জন আহত ও ৫৫ কোটি টাকার সম্পদ ক্রমাগত লুটপাট ও অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই তো হলো চৌধুরী সাহেবদের মডেল দেশ আমেরিকার সভ্য চেহারা।

চৌধুরী সাহেব মুসলমানদের ইতিহাস অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেও শান্তি ও ঐক্যের কোনো সন্ধান পাননি। শুধু পেয়েছেন নৃশংসতার নজির আর অনৈক্যের ঘটনা। ঢাকার তৎকালীন আন্টাঘরের ময়দানে হাজার হাজার সিপাহীকে ফাঁসিতে লটকিয়ে নাকি হত্যা করা হয় ঢাকার কোন এক নবাবের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে। এ ঘটনারও বর্ণনায় তিনি ইংরেজদের কথা ভুলেও উল্লেখ করেননি। তাই জানতে ইচ্ছে হয়, এতই যখন তার ইংরেজ-প্রীতি, তখন তিনি এ কথা বললেও পারতেন যে, এই তো আমি লন্ডন শহরে দু'যুগের অধিককাল ধরে আছি শুধু বাংলাদেশের মুসলমানদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে। তিনি বর্ণদাঙ্গার উস্তাদদের দেশে বাস করে হানাহানি দেখছেন শুধু মুসলমানদের।

চৌধুরী সাহেবরা যখন কথা বলেন, তখন বিবেকের সব ক'টি দ্বার বন্ধ করে কথা বলেন। তাই সত্য প্রবেশ করতে পারে না। সত্য প্রবেশ না করার কারণে ব্যক্তি স্বার্থে অন্ধ হয়ে তাঁরা নিজেদের গায়ে বরাবরই থুথু নিক্ষেপ করে রেশনদাতাদের 'সত্য ও সুন্দর' বলে নিমকহালালীর প্রমাণ রাখেন। তিনি আন্টাঘর ময়দানের হত্যাকাণ্ডের রেফারেন্স দিলেন, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য, খুনাখুনি আর রক্তপাতের কথা বললেন, কিন্তু যে জাতি এককালে মুসলমানদের এই ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য দীর্ঘকাল যুদ্ধ করেছে, হাজারো ষড়যন্ত্র করেছে, এই উপমহাদেশে এসে অন্য একটি জাতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে, মুসলমানদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে ধ্বংস করার জন্য সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছে, কারাবরণে বাধ্য করেছে, নির্বাসনে পাঠিয়েছে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে দেউলিয়া বানিয়েছে, সেই জাতির মাতৃ ও পিতৃভূমি বৃটেনে চৌধুরী সুখের জীবন-যাপন করছেন, এতে তাঁর লজ্জা-শরম নেই। যারা নিজ কুলঘাট ছাড়ে, তারা বেশরমই হয়ে থাকে। ইংরেজ জাতির ইতিহাসের পাতা উল্টাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করি। তাতে তিনি আত্মঘাতী বিরোধ, রক্তপাত এবং অনৈক্যই দেখতে পাবেন পাতায় পাতায়। তখন বলতে বাধ্য হবেন যে, মুসলমানদের ইতিহাসই কম রক্ত-রঞ্জিত। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, তাঁর প্রিয় খ্রিস্টান জাতি গত দু'হাজার বছরে বিশ্বের যত মানুষ খুন করেছে, গত ১৪শ' বছরে মুসলমানদের 'আত্মঘাতী বিরোধ' বা যুদ্ধে সে তুলনায় এক শতাংশ মুসলমানও নিহত হয়নি। চৌধুরী সাহেব ভালভাবে জানেন, একজন অস্ট্রিয়ান আর্ক ডিউক ফার্ডিনান্ডকে একজন সার্বিয়ান খ্রিস্টান হত্যা করেছিল। এ

www.nagorikpathagar.org

কারণে প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাত। সেটা ইতিহাস, কোনও গল্প-কাহিনী নয়। এই খ্রিস্টানরা এতই ভাল মানুষ যে, তাদের নবী যিশু খ্রিস্টকে পর্যন্ত সহ্য করতে পারেনি। তাঁকে শূলে চড়িয়েছিল। আল্লাহ্‌র কালাম পবিত্র ইঞ্জিলকে বিকৃত করেছিল এবং নিজ ধর্মকে তারা অধর্মের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল। নিজ নবীর প্রতি এবং নবীর শিক্ষার প্রতি যাদের এই আচরণ, তাঁরা এই পৃথিবীর যে 'কত ভাল মানুষ' তা চৌধুরী সাহেবদের বোঝার এখনো বাকি, তা ভেবে আমি বিস্মিত হই। হ্যাঁ, নিমক যখন তাদের খাচ্ছেন এবং তাদের দেশে বাস করছেন, তখন তাদের গায়ে আঁচড় যাতে না লাগে সেভাবে কথা বলতে হবে বৈ কি। নবীর গলায় যারা ফাঁসির রশি লাগায়, রক্ত পিচ্ছিল পথে যাদের যাত্রা শুরু, তাদের সম্পর্কে চৌধুরী সাহেবদের সাফাই গাওয়া শোভা পায় না। প্রথম মহাযুদ্ধটা মুসলমানরা বাধায়নি, খ্রিস্টানরাই এই মহাযুদ্ধের স্রষ্টা। সেই মহাযুদ্ধের সময় অর্থাৎ ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ভারদুনে যে ছয় লাখ লোককে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগে হত্যা করা হয়, এই হত্যাকারী আর নিহতরা উভয় ছিলেন খ্রিস্টান। ঐ হত্যাকাণ্ডকে চৌধুরী সাহেব কি মুসলমানদের 'আত্মঘাতি বিরোধের ফল' বলবেন? ১৯১৬ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এক কোটিরও বেশি লোক নিহত হয়, এটাও কি চৌধুরী সাহেব বলবেন মুসলমানদের আত্মঘাতি বিরোধের কারণে? জাপানে ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে আমেরিকা আণবিক বোমা নিক্ষেপ করেছিল, এতে আহত ও নিহত হয়েছিল লাখ লাখ লোক। নিশ্চয়ই তা মুসলমান রাজা-বাদশাহদের কাণ্ড ছিল না। এটি যে আমেরিকার খ্রিস্টান শাসকদেরই কাণ্ড ছিল, তা কি চৌধুরী সাহেব স্বীকার করবেন না? জার্মানদের বোমায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ৭০ হাজার ইংরেজ সিভিলিয়ান নিহত হয়। এটাও কি মুসলিম ভ্রাতৃঘাতী বিরোধের কারণে, না খ্রিস্টান আত্মঘাতী বিরোধের ফলে? চীনের নানকিং দখল করতে গিয়ে জাপান ১ লাখ চীনা সিভিলিয়ানকে হত্যা করে। বলুনতো, এটা কার ভ্রাতৃঘাতী বিরোধের ফল? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পাঁচ কোটি লোক প্রাণ হারায়। বলুনতো চৌধুরী সাহেব, এই পাঁচ কোটি লোকের প্রাণনাশের জন্য কি মুসলমানরা দায়ী? কোরিয়াতে কয়েক বছর যুদ্ধ চালু রেখেছিল কারা? এক কোরিয়াকে দুই কোরিয়ায় ভাগ করল কে? কোরিয়ার যুদ্ধে লাখ লাখ লোক মারা গেল কাদের ষড়যন্ত্রে? জার্মান ভাগ করল কে? বার্লিন বিভক্ত হলো কাদের চক্রান্তে? কাশ্মীরে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে কারা? ফিলিস্তিনি মুসলমানদের বিতাড়ন করে তাদের হত্যা ও নির্যাতন করে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলো কোন্ মুসলিম রাজা-বাদশাহ? লেবাননে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ জিইয়ে অশান্তির অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে রেখেছে কারা? ইরাক-ইরান এবং ইরাক-কুয়েতের মধ্যে যুদ্ধের দাবানল কে জ্বালিয়েছিল? সাপ

www.nagorikpathagar.org

হয়ে দংশন করে ওঝা হয়ে ঝেড়েছিল কারা? রাশিয়ায় জারের রাজত্বের কথাই বলুন আর লেনিন থেকে গর্বাচেভ পর্যন্ত শাসনামলের কথাই বলুন অথবা স্টালিন কর্তৃক কোটি কোটি লোক হত্যার কথাই বলুন, প্রত্যেকটি ছোট-বড় ঘটনার পিছনে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে যদি উত্তর পেতে চাই, তাহলে উত্তর একটিই পাওয়া যাবে আর তা হবে 'খ্রিস্টান', মুসলমান নয়। আজও বিভিন্ন মুসলিম দেশে এই খ্রিস্টানরাই হত্যা ও ষড়যন্ত্রের জাল ফেলে চৌধুরী সাহেবদের মত লোকদের দ্বারা বিবাদ বাধায়, যুদ্ধ লাগায় আর চৌধুরী সাহেবদের দ্বারাই আবার কাহিনী রচনা করিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে বলে, দেখ দেখ মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য নেই, ভ্রাতৃঘাতী বিরোধই প্রকট।

মুসলমানদের মধ্যে মুসলমান নামধারী এক শ্রেণীর আত্মবিক্রিত বুদ্ধি-ব্যবসায়ী আছেন, যারা অল্প পয়সায় কেনা-বেচার পণ্য হতে পারেন। মুসলিম জাতির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টিতে এবং মুসলিম জাতিকে গালি-গালাজে খ্রিস্টানরা তাদের ব্যবহার করে থাকে। আমাদের চৌধুরী সাহেবরা সেই অল্প দামে কেনাবেচার 'মাল'।

বৃটেনের সদর-অন্দর : আসুন, আমরা আলোচনা করে দেখি 'ভাল মানুষ' ইংরেজদের ইতিহাস। আমি এখানে রোমানদের অধীনে বৃটেন অথবা সামন্তবাদীদের শাসনাধীন বৃটেন সম্পর্কে কোন কথা বলতে চাই না। কারণ, চৌধুরী সাহেবরা বলবেন, ইংরেজরা তখন ছিল পরাধীন। পরাধীন জাতির ইতিহাস আবার কি হতে পারে? হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। তাই যে সময় থেকে রাজাদের রাজত্ব শুরু হয়, সে সময় থেকেই সংক্ষেপে 'ভাল মানুষ' খ্রিস্টানদের ইতিহাস তুলে ধরছি। এই ধারাবাহিকতার প্রথমেই নাম আসে নরম্যানডির ডিউক প্রথম উইলিয়ামের (১০৬৬-১০৮৭)। উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তিনি হামবার এবং টিজ-এর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডকে মরুভূমিতে পরিণত করেন। ইতিহাসে উল্লেখ আছে, পরবর্তী সাতশ' বছর পরেও ধ্বংসের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হতো। অসংখ্য লোককে তিনি হত্যা করেন। ফরাসি শহর মেনটেজকেও তিনি ভস্মীভূত করেন। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় উইলিয়াম (১০৮৭-১১০০)-এর রাজত্বকালকে আত্মঘাতি বিরোধ আর রক্তপাতের শাসনকাল বলা যায়। ১১০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁরই এক নাইট ওয়াল্টার টাইরেলের দ্বারা তীরবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। তাঁর লাশ জঙ্গলেই পড়ে থাকে। কয়েকজন শ্রমিক লাশ পড়ে থাকতে দেখে তা বহন করে নিয়ে আসে এবং বিনা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সমাহিত করে। প্রথম হেনরির (১১০০-১১৩৫) রাজত্বকালও আত্মঘাতি বিরোধের মধ্যদিয়ে কাটে। ফ্লেমবার্ডকে তিনি কারারুদ্ধ করেন। নিজ কন্যা মাতিলদাকে সিংহাসনের

www.nagorikpathagar.org

উত্তরাধিকার করার প্রশ্নে বিতর্ক শুরু হয়। গীর্জার সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য তুঙ্গে ওঠে। প্রথম হেনরির মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা সিংহাসনে আরোহণ করার কথা থাকলেও ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি সিংহাসনে বসতে পারেননি। স্টিফেন (১১৩৫-১১৫৪) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১১৩৮ সালে মাতিলদা সিংহাসন দাবি করে বসেন। শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। সেই গৃহযুদ্ধ ছিল প্রচণ্ড। আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছুই ছিল না। জনগণ এ অবস্থা দেখে একে অন্যে বলাবলি করতে থাকে, 'যীশুখ্রিস্ট এবং তাঁর সাথীরা ঘুমিয়ে আছেন।' ১১৪১ সালে স্টিফেন যুদ্ধে পরাজিত হন। মাতিলদা নিজেকে রানী ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁকে কিছু দিন পরই জনগণ লন্ডন থেকে বের করে দেয়। ১১৫৩ সালে মাতিলদার ছেলে ইংল্যান্ডে এসে আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই তো হলো খ্রিস্টান ঐক্যের নমুনা আর স্টিফেনের রাজত্বকাল।

দ্বিতীয় হেনরি (১১৫৪-১১৮৯) ক্ষমতায় এসে দেখেন বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপজাতি দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধনে কিছু পদক্ষেপ নেন এবং নতুন ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই ব্যক্তিটি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু টমাস, এ, বেকেট (Becket)-এর সঙ্গে যে আচরণ করেন, তাতে দ্বিতীয় হেনরির সকল সুনামের ওপর কলঙ্কের আস্তরণ পড়ে। বেকেট ছিলেন তাঁর এত প্রিয় বন্ধু, তাঁকে ছাড়া তিনি এক কদমও আগ-পিছ হতেন না। তাঁকে আর্কবিশপ পর্যন্ত করেছিলেন। হেনরির এই ভালবাসার মধ্যে বেকেট কেমন যেন একটা কৃত্রিমতার ছাপ দেখতে পান। একদিন তিনি বলে ফেলেন, You will soon hate me as much as you love me now. অর্থাৎ তুমি শিগগিরই আমাকে ঘৃণা করবে, যে পরিমাণ তুমি আমাকে এখন ভালবাস। হলোও তাই, একদিন বেকেট চার্চে একটি দাবি নিয়ে দ্বিতীয় হেনরির কাছে আসেন এবং চার্চের প্রতি রাজার নীতির সমালোচনা করেন। বন্ধুর মুখে তার সমালোচনা শুনে তিনি এতই ক্ষুব্ধ হলেন, সাথে সাথেই হুংকার দিয়ে বললেন, Is there none of the cowards eating my bread who will rid me of this turbulent priest? অর্থাৎ এই কাপুরুষদের মধ্যে আমার নিমকখোর কি কেউ নেই, যে এই অবাধ্য পাদ্রী থেকে আমাকে মুক্তি দিতে পারে? দ্বিতীয় হেনরি-এর কথা উচ্চারণের সাথে সাথে চারজন নাইট বেকেটকে বেধে গীর্জায় নিয়ে যায় এবং সেখানেই তাকে হত্যা করে। এই দ্বিতীয় হেনরি তার রাজত্বে ঐক্যের বটবৃক্ষ সৃষ্টি করাতো দূরের কথা, নিজের সন্তানগুলোকে অনুগত রাখতে পারেননি। সন্তানরা পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হেনরি ভগ্নহৃদয় নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তার শেষ কথা নিজেকে উদ্দেশ্য করেই উচ্চারণ করেছিলেন Shame Shame on a conquered king!

www.nagorikpathagar.org

গাজী সালাহউদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় হেনরির দ্বিতীয় পুত্র প্রথম রিচার্ডকে নিয়ে খ্রিস্টান জগত খুবই গর্ব করে থাকে এবং তাঁকে 'সিংহ দিল রিচার্ড' বলে অভিহিত করে। তিনি যে কত বড় কাপুরুষ ছিলেন, সে কাহিনী ইতিহাসে উল্লেখ আছে। তিনি গর্ব করে বলতেন, আমি যদি একজন ভাল ক্রেতা পেতাম, তাহলে লন্ডন বিক্রি করে দিতাম। এই রিচার্ড এক খ্রিস্টানের তরবারির আঘাতে নিহত হন।

জন (১১৯৯-১২১৬) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আর্থারের সঙ্গে সিংহাসন নিয়ে কিভাবে কাড়াকাড়ি করেন এবং ১২০২ খ্রিস্টাব্দে রোয়েন নামক স্থানে আর্থারকে কিভাবে হত্যা করেন, তাও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। ইংল্যান্ডের ব্যারন, চার্চ এবং পোপদের সাথে তাঁর বিরোধ প্রকট আকার ধারণ করেছিল। তাঁর আমলে যদিও মেঘনাকার্টার দলিলটি রচিত হয়েছিল, কিন্তু এর কৃতিত্ব তিনি নিতে পারেননি। খুন-খারাবি আর রক্তপাতের দুর্নাম তিনি কুড়িয়েছিলেন। এক যুদ্ধে নদী পাড়ি দেয়ার সময় জন সর্বস্ব হারিয়ে কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তৃতীয় হেনরির (১২১৬-১২৭২) পার্লামেন্টকে বলা হত পাগলদের পার্লামেন্ট। তাঁর হাত খুন-খারাবি আর রক্তপাত থেকে মুক্ত ছিল না। প্রথম এডওয়ার্ডের (১২৭২-১৩০৭) শাসনকালেও নিজেদের মধ্যে বিরোধ ও হানাহানির শাসনকাল নামে পরিচিত ছিল। চার্চ এবং ব্যারনদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত। ১২৯৭ সালে পাদ্রীরা রাজাকে ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করে। তিনি ইহুদিদের দেশ থেকে বিতাড়ন করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হননি। দ্বিতীয় এডওয়ার্ড ছিলেন (১৩০৭-১৩২৭) একজন বাচাল ও উদ্ধত ব্যবহারের লোক। পিয়ার্স গেবেস্টন নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তিনি কিভাবে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে তুলে তাকে শেষ করেন এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী রগার মারটিমারকে শূলে চড়ান, তা ইতিহাসে উল্লেখ আছে। তাঁরই আমলে অর্থাৎ ১৩৩৮ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে 'শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ' শুরু হয়। সেই যুদ্ধ বিভিন্ন বিরতিতে শত বছরই চলেছিল। লোক ক্ষয় হয়েছিল অনেক। দ্বিতীয় রিচার্ড (১৩৭৭-১৩৯৯) ক্ষমতায় এসেই জন উইক্লিফ এবং তার অনুসারীদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হন। এখানে উল্লেখ্য, উইক্লিফ এবং তার কয়েকজন অনুসারী বাইবেলের প্রথম অনুবাদ ইংরেজিতে করেন। তার রাজত্বকালে শ্রমিক অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করে। কৃষকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তিনি নিজের সিংহাসনকে কন্টকমুক্ত রাখার জন্য হেরীফোর্ড এবং নরফক এর দু'জন ডিউককে নির্বাসন দেন। কিন্তু তবুও শান্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। আয়ারল্যান্ড থেকে ফিরে এসে তিনি দেখেন, তারই এক খালাতো ভাই সেনাবাহিনীর প্রধান হয়ে বসে আছেন। বাধ্য হয়ে

www.nagorikpathagar.org

তিনি আত্মসমর্পণ করেন। এর পরের বছরই আপন লোকের হাতেই নিহত হন তিনি। চতুর্থ হেনরি (১৩৯৯-১৪১৩) ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করে পার্লামেন্ট এবং চার্চের সমর্থন পাওয়ার জন্য প্রথমেই উইক্লিফের সমর্থকদের হত্যা করতে থাকেন। তিনি ঘোষণা করেন, চার্চের অনুমোদন ছাড়া যারা ধর্ম প্রচার করবে, তাদের অগ্নিদগ্ধ করে মারা হবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি নিজের শাসনকালকে নিষ্কন্টক রাখতে পারেননি। পঞ্চম হেনরির (১৪১৩-১৪২২) রাজত্বকাল গণবিদ্রোহ আর খুন-খারাবির রাজত্বকাল বলে অভিহিত। তিনজন ধর্ম প্রচারককে হত্যা করে তিনি তাঁর শাসনকাল শুরু করেন। তাঁর সিংহাসনের দাবিদার এক ব্যক্তিকে তিনি লন্ডনের টাওয়ারে বন্দি করে রাখেন। তিনি যাকে সন্দেহ করতেন, তাকেই হত্যা করতেন। আর এভাবেই তিনি 'মহান শাসক'-এর খেতাব নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ষষ্ঠ হেনরির (১৪২২-১৪৬১) রাজত্বকালে গৃহবিবাদ প্রকট আকার ধারণ করে। ইতিহাসে এই গৃহ বিবাদের নাম Wars of the roses নামে খ্যাত। এ গৃহ বিবাদ ১৪৫৩ সালে শুরু হয় এবং দীর্ঘ দিন চলে। এই যুদ্ধে অসংখ্য প্রাণহানি ঘটে। চতুর্থ এডওয়ার্ড, পঞ্চম এডওয়ার্ড এবং তৃতীয় রিচার্ডের শাসনামলও শান্তি ও সুখের ছিল না।

ইংরেজদের ইতিহাসের যেসব ঘটনা তুলে ধরলাম, তা যদি চৌধুরী সাহেবরা ভুল বলে প্রমাণ করতে না পারেন, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, খ্রিস্টানদের শাসনকালও অনৈক্য, সংঘাত, রক্তপাত, আত্মঘাতী বিরোধ এবং ক্ষমতার কামড়াকামড়ি থেকে মুক্ত নয়।

সপ্তম হেনরি ক্ষমতার মসনদে বসে চতুর্দিকে দেখেন স্বজনদের বিদ্রোহ। বিদ্রোহী স্বজনদের দমন করতে গিয়ে তিনিও রক্তপাত ঘটানোর প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অবলম্বন করেন। অষ্টম হেনরী (১৫০৯-১৫৪৭) ক্ষমতায় বসেই এম্পসন ও ডুডলেককে হত্যা করেন এবং বড় ভাই আর্থারের বিধবা স্ত্রী ক্যাথরিনকে বিবাহ করেন। এ বিবাহের কয়েক বছর পর তিনি এ্যানে বোলিয়ন নামক এক মহিলার প্রেমে পড়েন। ফলে ক্যাথরিনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই বিবাহ বিচ্ছেদের সূত্র ধরে রোম এবং স্পেনের সঙ্গে অষ্টম হেনরির বিবাদের সূচনা ঘটে। এরই সূত্র ধরে তার অতি প্রিয়ভাজন স্যার টমাস মুয়র মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ক্রমওয়েলকেও এর জের হিসেবেই প্রাণ হারাতে হয়। ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের (১৫৪৭-১৫৫৩) শাসনকালও শান্তি-স্বস্তির মধ্যদিয়ে কাটেনি। আপন চাচা সোমারসেটকে তিনি কিভাবে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং তার শত্রুদের কি নির্মমভাবে দুনিয়া থেকে চিরতরে অপসারিত করেন, সে কাহিনী ইতিহাসে বিধৃত। এডওয়ার্ডের মৃত্যুর খবর কয়েক দিন পর্যন্ত গোপন রেখে লেডী জেইন

www.nagorikpathagar.org

গ্রে কিভাবে ষড়যন্ত্র করে সিংহাসনে বসেন এবং পরবর্তী সময়ে তাকে ও তার স্বামীকে টাওয়ারে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়; নর্থাম্বারল্যান্ডের ডিউককে কিভাবে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়; আর এ সুযোগে অষ্টম হেনরির কন্যা মেরী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, সে কাহিনী বড়ই দুঃখজনক। শুধু তাই নয়, ওয়াটের বিদ্রোহ, লেডী জেইন গ্রের মৃত্যুদণ্ড; পাদ্রীদের উপর জুলুম-নির্যাতন এবং ধর্মীয় কারণে কয়েকজন পাদ্রীকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা ইত্যাদি ঘটনার জন্য মেরীর শাসনকাল (১৫৫৩-১৫৫৮) কুখ্যাত হয়ে আছে। মেরীর পর তার সৎ বোন প্রথম এলিজাবেথ ক্ষমতায় আসেন এবং নিজেকে রানী ঘোষণা করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৫৫৮-১৬০৩ খ্রিস্টাব্দ। এলিজাবেথের ৪৫ বছরের শাসনকাল নানা সংকট আর কেলেংকারিতে ছিল ভরপুর। মেরীর শাসনকালে প্রোট্যাষ্ট্যান্টদের কলহ আবার তুঙ্গে উঠে। তারই শাসনকালে 'হাড্ডি নিয়ে দুই কুকুরের টানাটানি' এ প্রবাদ বাক্যটি সৃষ্টি হয়। এলিজাবেথের রাজত্বকালে মেরীর এক ইতালীয় চাকর জীবিত ছিল। তার নাম ছিল রিজজিও। অজ্ঞাত কারণে লর্ড ডার্নলের নেতৃত্বে কতিপয় ব্যক্তি ঐ লোকটিকে হত্যা করে। এর পরিণামে ডার্নলেককেও হত্যা করা হয়। এলিজাবেথের রাজত্বকালেও অসংখ্য লোককে হত্যা করা হয়। প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের পিছনে আবিষ্কার করা হত এলিজাবেথকে ক্ষমতার মসনদ হতে 'উৎখাতের ষড়যন্ত্র'। প্রথম জেমস (১৬০৩-১৬২৫) একইভাবে হত্যা আর রক্তপাতের মধ্যদিয়ে শাসনকাল অতিবাহিত করেন। পিউরিটান পার্টির ক্রমবর্ধমান শক্তি লাভে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। জেমসের শাসনকালের প্রায় শুরুতে কেটেসপাই নামক এক রোমান ক্যাথলিকের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এক ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হয়। সেই ষড়যন্ত্রটি ছিল এই, রাজা যখন তার পরিষদ নিয়ে পার্লামেন্টে বসবেন, তখন শক্তিশালী বিস্ফোরক দিয়ে রাজা ও তার পরিষদ এবং পার্লামেন্টকে উড়িয়ে দেয়া হবে। এই লক্ষ্য সামনে নিয়ে হাউস অব লর্ডের ভূগর্ভস্থ একটি কুঠরি বিস্ফোরক দিয়ে ভর্তি করা হয়। গুয়েপাউক নামক এক ব্যক্তিকে অগ্নিসংযোগ করার জন্য মোতায়েন করা হয়। ১৬০৫ সালের ৫ই নভেম্বর এই ঘটনাটি ঘটার কথা ছিল, কিন্তু ষড়যন্ত্রটি ফাঁস হয়ে পড়ে। ষড়যন্ত্রকারী সকলকে হত্যা করা হয়। রাজা জেমস স্যার ওয়াল্টার রেলীকে কিভাবে দীর্ঘ দিন বন্দী রেখে মৃত্যুদণ্ড দেন, সেই ইতিহাসও বড়ই করুণ। তারই শাসনামলে ১৬১৮ সালে 'ইউরোপের ৩০ বছরের যুদ্ধ' শুরু হয় এবং সে যুদ্ধ উত্তর জার্মানির প্রোট্যাষ্ট্যান্ট এবং দক্ষিণ জার্মানির ক্যাথলিকদের মধ্যেই সংঘটিত হয়। প্রথম চার্লসের (১৬২৫-১৬৪৯) শাসনকালকেও গৃহবিবাদের শাসনকাল বলে অভিহিত করা যায়। বাকিংহামের ডিউককে তিনি হত্যা করেন এবং পার্লামেন্ট ছাড়া দেশ শাসন করেন ১১ বছর। স্ট্যাফোর্ড এবং লাউডকে তিনি

www.nagorikpathagar.org

হত্যা করেন। ১৬৪২ থেকে ১৬৪৫ সাল পর্যন্ত ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ চলে। এই গৃহযুদ্ধের জের হিসেবে বিদ্রোহী সেনারা তাকে গ্রেফতার করে এবং শিরচ্ছেদ করে। অতঃপর দেশ শাসনের ধারার পরিবর্তন ঘটে। ১৬৪৯ থেকে ১৬৬০ সাল পর্যন্ত কমনওয়েলথ শাসন নামে এক শাসন প্রবর্তিত হয়, কিন্তু তাও ১৬৬০ সালেই বাতিল হয়ে যায়। ক্ষমতায় আসেন দ্বিতীয় চার্লস (১৬৬০-১৬৮৫)। তারই শাসনকালে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত দু'টি রাজনৈতিক দল হুইগ এবং টোরি নামে আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় চার্লসের শাসনকাল কেমন ছিল, এ সম্পর্কে তার মৃত্যুর পর যে কথাটি কিংবদন্তীর মত লোকমুখে উচ্চারিত হত, তা ছিল এই-

Here lies our sovereign lord the king.
Whose word no man relies on.
He never said a foolish thing.
And never did a wise one.

অর্থাৎ এখানে শুয়ে আছেন আমাদের মহা প্রতাপশালী রাজা, যার কথায় কেউ বিশ্বাস করতো না। তিনি কখনো বোকার মত কথা বলেননি এবং কখনো তিনি জ্ঞানের একটি কথাও বলেননি।

দ্বিতীয় জেমস (১৬৮৫-১৬৮৮)-এর শাসনামল মনমাউথের বিদ্রোহ দমনের মধ্যদিয়ে কেটে যায়। তারপর উইলিয়াম এবং মেরী (১৬৮৯-১৬৯৪) এবং তৃতীয় উইলিয়াম (১৬৯৪-১৭০২), এ্যানের শাসন কাল (১৭০২-১৭১৪), প্রথম জর্জ (১৭১৪-১৭২৭), দ্বিতীয় জর্জ (১৭২৭-১৭৬০), তৃতীয় জর্জ (১৭৬০-১৮২০), চতুর্থ জর্জ (১৮২০-১৮৩০), চতুর্থ উইলিয়াম (১৮৩০-১৮৩৭), ভিক্টোরিয়া (১৮৩৭-১৯০১), সপ্তম এডওয়ার্ড (১৯০১-১৯১০), অতঃপর পঞ্চম জর্জ ও ষষ্ঠ জর্জ থেকে দ্বিতীয় এলিজাবেথের বর্তমান শাসনকাল পর্যন্ত যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, সে ইতিহাস কখনো বিরোধ আর রক্তপাতমুক্ত নয়, ইতিহাস এ সাক্ষ্যই দেয়। ভিক্টোরিয়া থেকে শুরু করে দ্বিতীয় এলিজাবেথ পর্যন্ত যারা ইংল্যান্ডেশ্বর আর ইংল্যান্ডেশ্বরী হয়ে ক্ষমতাসীন ছিলেন, তারা বিশ্বের কোটি কোটি লোককে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হত্যা করেছেন সাম্রাজ্য ঠিক রাখার জন্য। এসব ইতিহাস চৌধুরী সাহেবরা জানেন, কিন্তু বর্তমানে তাঁরা সাবেক প্রভুদের নিমক খাচ্ছেন বলে কোন কথা বলেন না। দোষ দেখেন শুধু মুসলমানদের। বিলেতে বাস করলে রুশদীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করা কারো কারো পক্ষে যে সম্ভব, তা অবশ্য আমরা বুঝি।

আজ থেকে প্রায় ছয়শ' বছর আগে ব্রিটিশরা আয়ারল্যান্ডের আদি অধিবাসীদের বিতাড়িত করে তাদের স্থলে বহিরাগত প্রেসবাইটোরিয়ানদের

www.nagorikpathagar.org

বসিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে নানা কৌশল অবলম্বন করে এবং যুদ্ধ করেও এ অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উত্তর আয়ারল্যান্ডের অধিকাংশ এলাকা স্বাধীন হলেও উত্তরাঞ্চলের ৬টি প্রদেশ যুক্তরাজ্যের অধীন থেকে যায়। তখন থেকেই এখানে গোলযোগ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই এলাকায় বসবাসকারী প্রোট্যাস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে সংহতির প্রচেষ্টা খুব কমই সফল হয়েছে। উক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য পুরো মাত্রায় বিদ্যমান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ক্যাথলিক ও প্রোট্যাস্ট্যান্ট ছাত্ররা আলাদা ইউনিফরম পরতো। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রোট্যাষ্ট্যান্টদের জন্য চাকরি, এমনক ঘর-বাড়িও সংরক্ষিত থাকে। নির্বাচনী এলাকাগুলো এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়, যাতে ক্যাথলিকরা কোন ফায়দা উঠাতে না পারে। অথচ ক্যাথলিকরাই মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। এই তো হলো মানবতাবাদী (?) ব্রিটিশ শাসননীতি।

বর্ণদাঙ্গা : বর্ণদাঙ্গা তো বৃটেনের ঐতিহ্য। ৭০ দশকের শেষ দিকে একবার একটি সচিত্র মিনি পোস্টার লন্ডনের রাস্তার দেয়ালে দেয়ালে, টিউব স্টেশন ও বাসষ্ট্যান্ডে সেঁটে দেয়া হয়। পোস্টারের চিত্রটি ছিল দাড়িওয়ালা ও পাগড়িধারী শিখের এবং চিত্রের নিচে ক্যাপশন ছিল, They are robbing your money, They are occupying your houses. Drive them out. অর্থাৎ এরা তোমাদের অর্থ লুট করছে, তোমাদের বাড়ি দখল করছে, এদের হটাও। পোস্টার প্রচারকরা এর ব্যাখ্যা দিয়েছিল এভাবে, এটা একটা সিম্বল (প্রতীক) মাত্র। সকল কালা আদমীর বিরুদ্ধে আমাদের এই অভিযান। এসব অভিযানের অন্যতম উদ্যোক্তা 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট ও স্কীন হেড'-এর নেতা ইনক পাওয়েল স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'বৃটেন বিশ্বে তার সাম্রাজ্য হারিয়েছে, অর্থবিত্ত বা সম্পদ আসছে না। আসছে দারিদ্র্য, অভাব, হতাশা আর কালো আদমীর দল। ওদের ফেরত পাঠাতে না পারলে বৃটেন হবে 'ব্ল্যাক বৃটেন'। ক্ষমতায় আসার পূর্বে টোরী দলের নেত্রী মিসেস মার্গারেট থ্যাচারও বলেছিলেন, বহিরাগতদের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তাতে বৃটেনের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। বৃটেনে বর্ণদাঙ্গার কারণ কোথায় নিহিত, মার্গারেট থ্যাচারের এ উক্তি জানার পর বোধহয় আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না।

১৯৮১ সালের পরিসংখ্যান দিচ্ছি। লন্ডন থেকে ২রা নভেম্বর (১৯৮১) সিনহুয়া পরিবেশিত সংবাদ ছিল এই, গত বছর বৃটেনে অপরাধের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময় বৃটেনে ও ওয়েলসে প্রায় ৩০ লাখ অপরাধমূলক ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে প্রকাশিত অপরাধ সংক্রান্ত এক সমীক্ষায় অপরাধমূলক কার্যকলাপ শতকরা দশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দেখানো

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে। গত দশকের গড় অপরাধের তুলনায় এ সংখ্যা দ্বিগুণ। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে যে সব স্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে, পরিসংখ্যানে শুধু তাই দেখানো হয়েছে। স্কটল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের অপরাধের ঘটনা এখানে দেখানো হয়নি। পরিসংখ্যানে বলা হয়, শতকরা ২০ ভাগ সিঁদেল চুরি, ৩ ভাগ ডাকাতি ও ৮ ভাগ পিস্তলের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময় এক লাখ দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। '৮০ সালের তুলনায় এ সংখ্যা শতকরা ৩ ভাগ বেশি। গুরুতর অপরাধ শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সংখ্যাও গত দশকের তুলনায় গড়ে তিন গুণ বেশি। এখন ২০০০ সাল। অপরাধ আর দাঙ্গার ঘটনা সে অনুপাতে কত হতে পারে, তা অনুমান করা বোধ হয় কঠিন নয়। কোন মুসলিম বিশ্বে এমন বর্ণদাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে কি?

বৃটেনে গৃহহীনদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। গরীবরা আরও গরীব হচ্ছে, ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে। বৃটেনে ১৯৮৬ সালের হিসাবেই ১ কোটি ৬৩ লাখ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। প্রতি ৮ জনে একজন নিরক্ষর। বৃটেনের যৌন জীবন ধারা আর যৌন কেলেংকারীর কথা নিয়ে আলাদা লেখালেখির কোন প্রয়োজন পড়ে না। কারণ, গোটা দেশই যৌন ভাইরাসে আক্রান্ত। বৃটেনের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী এবং তার এককালীন মহিলা সচিবের মধ্যে যৌন কেলেংকারীর যে ঘটনা ঘটে, তা বৃটেনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৯৬৩ সালে হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের সরকারের সময় মন্ত্রী জন প্রফুমো প্রমোদবালা ক্রিস্টিনো কিলারকে শয্যাসঙ্গিনী করলে প্রফুমোকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। ১৯৭৩ সালে জুনিয়র প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লর্ড লাম্পটনকে পদত্যাগ করতে হয়। কারণ, এক প্রমোদবালার সাথে বিছানায় শুয়ে তিনি ছবি তুলেছিলেন।

বৃটেনের এমপিরাও যৌন কেলেংকারী ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, এমন ঘটনাও ফাঁস হয়েছে ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে। সম্প্রতি বৃটেনে হাউস অব কমন্সের অর্থাৎ পবিত্র সংসদ ভবনের মধ্যে টোরি এমপি ও ক্ষমতাচ্যুত মন্ত্রী মিঃ হার্টিলে বুথ তার গোপন প্রেমিকা নগ্ন মডেল এ্যামিলা বারের সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন। এই গোপন তথ্য ফাঁস করেছেন খোদ তার প্রেয়সী এ্যামিলা বার। ২২ বছরের সুন্দরী মডেল মিস বার বলেছেন, মিঃ বুথ যৌন কর্মে লিপ্ত হবার আগে খুব তাড়াহুড়ো করেননি। তিনি শুধু গিয়েছিলেন হাউসে ভোট দেয়ার জন্য। ৪৭ বছর বয়সের বিবাহিত ৩ সন্তানের জনক মিঃ বুথ ৪ মাস ধরে এ্যামিলা বারের সাথে যৌন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। মিস বার বলেন, মিঃ বুথ বলেছেন, 'আমার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু যৌন সম্পর্ক ছিল না, এটা সত্য নয়। এ কথা মিঃ বুথ নিজেও জানেন।'

www.nagorikpathagar.org

মিস বার বলেছেন যে, আমার যৌন সম্পর্কের কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারণ, হিপোক্রেসির কোন অর্থ নেই। অর্ধেক সত্য বলে থেমে যাওয়া হিপোক্রেসিরই সামিল। মিঃ বুথেরও স্বীকার করা উচিত যে, আমাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক ছিল।

মিস বার দাবি করেছেন, মিঃ বুথ হাউস অব কমন্সে তার তালাবদ্ধ কামরায় যৌন ক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া ইইসি-এর কাজে ব্রাসেলসে যাচ্ছেন বলে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে মিঃ বুথ ও মিস বার প্যারিসে রোমান্টিক সপ্তাহের শেষ দিন কাটান। মিস বার আরও দাবি করেছেন, তিনি যখন তাদের গোপন সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করেন, তখন মিঃ বুথ ৪০ হাজার পাউন্ড খরচ করে এক ব্যাংকোয়েট দেন। কমনসভার কেন্দ্রীয় লবির বিপরীত দিকে সার্জেন্ট এট আর্মসের ঘরের কাছে মিঃ বুথের অফিস ঘর। কোন হৈ চৈ নেই। কাজ করার অজুহাতে অনেক দিন তিনি সেখানে থাকতেন। উদ্দেশ্য ছিল, যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া। মিস বার বলেছেন, আমরা সেখানে দরজা বন্ধ করে মিলিত হতাম। যখন সংসদের ডিভিশন বেল বাজতো, তখন মিঃ বুথ ভোট দেয়ার জন্য যেতেন, আবার ফিরে আসতেন। মিস বার বলেন, রাত সাড়ে ন'টার দিকে আমরা মিলিত হতাম। মিস বার মিঃ বুথের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে বলেছেন যে, মিঃ বুথের পরিবারের জন্য আমি দুঃখিত। হাউস অব কমন্সে মিঃ বুথ ও মিস বারের এই অভাবনীয় যৌন কর্মকাণ্ডের খবরে যে কোন লোকেরই মর্মাহত হবার কথা। যে পবিত্র জায়গায় বসে দেশ চালাবার জন্য আইন-কানুন, রীতিনীতি, নৈতিকতা রক্ষার দায়িত্ব এবং যাদের ওপর জনগণ বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, তারা যদি নৈতিকতা ও সমাজ বিরোধী কাজ করেন এবং আইন অমান্য করেন, তাহলে তাদের কি শাস্তি হওয়া প্রয়োজন-তা তারাই ভাল জানেন। বৃটেনের মিডিয়াতে খবর প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে কেলেংকারির সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠে। সরকার ও দলের মান-ইজ্জত বাঁচানোর জন্য দলীয় নেতাকে নিতে হয় কঠোর ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থা হলো, কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত মন্ত্রী ও এমপিদের ক্ষমতাচ্যুত করা। অবশ্য এমপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন নিজ নিজ এলাকার ভোটাররা। (ইনকিলাব ৮/৩/৯৪ ইং)।

'ভাল মানুষের দেশের' যে কথা-কাহিনী আর ইতিহাস তুলে ধরলাম, চৌধুরী সাহেবরা তা চ্যালেঞ্জ করার মত কিছু পাবেন বলে আমি মনে করি না। দোষ সকলেরই আছে, কারো কম আর কারো বেশি। মানুষের প্রকৃতিতে দ্বন্দ্ব-কলহের যে সব উপসর্গ আছে, তার প্রকাশ ঘটবেই। যারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তারা তো পারেই। আর যারা নিয়ন্ত্রণে অক্ষম, তারা নানা অঘটন ঘটায়। মানব

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃতিকে যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা না হয়, তাহলে 'যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' সব সময় দেখা যায়। তাছাড়াও যদি প্রবাসী তনখাখোরদের ঘাড়ে খ্রিস্টান-ইহুদি ভূত চাপে, রুশদীদের আছর পড়ে, তাহলে তো তারা একতরফা মুসলমানদের দোষ দেখে থাকবেই। দেশে-বিদেশে সেই আছরে আর তাছিরে প্রভাবিত হয়ে চৌধুরীরা আর তসলিমারা নিজ মিল্লাতের দোষ দেখেই চলছেন। ভাড়ায় খাটা বুদ্ধি বিক্রিজীবীরা তাই করে থাকেন। ডায়ানার চরিত্রকে চৌধুরীরা আদর্শ চরিত্র বলে মনে করেন।

নিজের আয়নায় চৌধুরী : জনাব আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী দীর্ঘ ১৮ বছর পর লন্ডন থেকে ঢাকায় এসে বিভিন্ন কাগজে লেখালেখি শুরু করেন এবং ইন্টারভিউ দিতে থাকেন। তাঁর সে সময়ের তাজা লেখায় এবং ইন্টারভিউতে যে সব বক্তব্য আসে, তা ছিল তাঁরই অতীত জীবনের অনেক লেখা ও ভূমিকার বিরোধী। এই স্ববিরোধীতার মুখোশ উন্মোচন করে দৈনিক দিনকালে জনাব আহমদ মুসা 'ধীরে, গাফফার চৌধুরী, ধীরে' এই শিরোনামে ১৮/১/৯৩, ১৯/১/৯৩, ২৩/১/৯৩, ২৮/১/৯৩ এবং ৪/২/৯৩-এই পাঁচ দিনে তাঁর ধারাবাহিক নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। আমি এখানে এই পাঁচটি নিবন্ধের সারাংশ পাঠকদের জন্য পেশ করছি। এ দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, জনাব চৌধুরী রূপ ও দিক পরিবর্তনে কত পারঙ্গম।

১৯৭০ সালের ৯ই অক্টোবর, স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর মাত্র ৫ মাস আগে, দৈনিক পূর্বদেশ-এর তৃতীয় কলামে শেখ মুজিব সম্পর্কে আপনি (আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী) লিখেছিলেন, 'সে দিন সহসা আমার চোখের সামনে থেকে একটি বড় যবনিকা সরে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, আমার চোখের সামনে কল্পনার কোন 'অসাধারণ নেতা' নন, সেই সাধারণ শেখ মুজিব বসে রয়েছেন। ফিডেল ক্যাস্ট্রো কেন, নাগা নেতা ফিজোর সঙ্গেও যাকে তুলনা করা হাস্যকর। চরিত্রে দক্ষিণপন্থী, নীতিতে সংগ্রাম বিমুখ, কেবল জেল গমন ও চাপ প্রয়োগের আপসবাদী রাজনীতির সেই পুরনো শেখ মুজিব, আড়াই বছরে তার চরিত্রের কিছু বদলায়নি (জেলে থাকার সময়টুকুর কথা বলা হচ্ছে) রাস্তায় নেমে অনেক ভাবলাম, তাহলে এই বাঘ-ছাল গায়ে ছদ্মবেশী সংগ্রামীর ভূমিকা গ্রহণ করা কেন? তরুণ মানসে এই উন্মাদনা সৃষ্টিই বা কেন? গান্ধী-আরউইন চুক্তির মতো তিনিও তো ঘোষণা করলে পারতেন মুজিব-হারুন কিংবা মুজিব-দৌলতানা চুক্তির মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার স্বরাজ আসবে।

'কথায় বলে বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়া সহজ, নামা বড় কঠিন'। এতদিন বাঘ ছাল গায়ে বিপ্লব ও সংগ্রামী শ্লোগানের বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে শেখ

www.nagorikpathagar.org

সাহেব বহুবার ঐক্যবদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন এড়িয়ে চলেছেন। এখন সুযোগ মতো বাঘ-ছাল ফেলে বাঘের পিঠ থেকে নামতে গিয়ে তিনি নিজেই সেই বাঘের মুখোমুখি হয়েছেন।' একই লেখার আরেক পর্যায়ে তিনি উল্লেখ করেছেন-

'১৯৬৬ সালের আগে আমি শেখ মুজিবকে ঘরোয়াভাবে দেখেছি। তারপর আর কাছাকাছি দেখিনি। ১৯৬৭ সালের আগে যে শেখ মুজিবকে চিনতাম, তিনি প্রাদেশিক পরিষদের একজন সাধারণ নেতা, লেখাপড়ায় তেমন নাম নেই। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কেও বুদ্ধিজীবী মহলে তেমন কোন আকর্ষণ ও শ্রদ্ধাবোধ নেই বরং একটা অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব রয়েছে।'

কলামের আরেক পর্যায়ে শেখ মুজিবকে কেবলমাত্র ব্যঙ্গ করার জন্যই যেন তিনি লিখেছেন,

'১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে দেশে দ্বিতীয় দফা সামরিক আইন জারি হলো। শেখ সাহেব তখন ঢাকায়। শুনলাম তিনি চট্টগ্রাম সফর বাতিল করেছেন। চারিদিকে অসংখ্য প্রত্যাশা-ব্যাকুল মুখে (যে প্রত্যাশা শেখ সাহেব নিজেই সৃষ্টি করেছেন) একটি মাত্র প্রশ্নের গুঞ্জরণ শুনলাম। শেখ সাহেব এখন কি করবেন? তিনি দেশের মানুষকে কি নির্দেশ দেবেন? পর দিন কাগজ উল্টালাম। না কিছু নেই। বিকেলে বহু দিন পর আবার ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর রাস্তার দিকে এগোলাম। চারদিকে ঝিরঝিরে বিকেলের বাতাস। আমাকে দেখে (শেখ মুজিব) বিমর্ষ হেসে বললেন, আসুন চৌধুরী আসুন। বললাম, ব্যক্তিগত সাক্ষাতের জন্য নয়, সাংবাদিক হিসেবে এসেছি। দেশের বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার মত কি? শেখ সাহেব বললেন, 'আমি তৈরি হয়ে রয়েছি। আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম, তৈরি হয়ে রয়েছেন কিসের জন্য? তিনি বললেন, 'সুটকেস গুছিয়ে রেখেছি, যদি নিতে আসে, তারা দেখবে আমি তৈরি। জেলের গাড়িতে উঠে পড়বো'। আমি হতাশ কণ্ঠে বললাম, শুধু জেলে গেলেই কি আপনার সব সমস্যার সমাধান? তিনি আগের মতোই নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, 'আর কি করতে পারি? আমি সুটকেস গুছিয়ে তৈরি হয়ে রয়েছি।'

সমসাময়িককালে একটি কথা বাজারে প্রচলিত ছিল যে, শেখ মুজিবকে নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে অবাঙালি ব্যবসায়ীদের একটি অংশের হাত রয়েছে। এ কথাও প্রচলিত ছিল, আওয়ামী লীগ মার্কিন মদদ পাচ্ছে এবং বাঙালি উঠতি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব করছে। এগুলোর সত্যতা কতটুকু এই বিতর্কে না গিয়েও বলা চলে যে, কথিত ধারণাগুলো ব্যাপ্তি লাভ করেছে গাফ্‌ফার চৌধুরীদের মতো লেখকদের লেখার মাধ্যমে। এ বিষয়ে ১৯৭০ সালের ২রা

www.nagorikpathagar.org

অক্টোবর লেখা 'তৃতীয় মত'-এর একটি অংশ তুলে ধরেছি। তিনি তাতে লিখেছেন, 'সম্প্রতি ঢাকার একটি চৈনিক রেস্তোরাঁয় এক উৎসব রজনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। আর এই উৎসব রজনীর প্রধান আকর্ষণ ছিল সুস্বাদু চীনা খাদ্য। আওয়ামী লীগ প্রধানের আয়োজিত এই ভোজসভায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ঢাকার অধিকাংশ পত্রিকার সাংবাদিক। এই অভিজাত হোটেল ও আওয়ামী লীগের মধ্যে একটা যোগাযোগ ভেবে নেয়া কষ্টসাধ্য নয়। কারণ, অনেকেই বলে থাকেন, আওয়ামী লীগ উঠতি বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠান। এই উঠতি বুর্জোয়াদের চোখ উঁচু দিকে, নিদেনপক্ষে এগার তলা হোটেলের বল রুমে গিয়ে ঠেকলে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাই আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ কোন রাজনৈতিক দলের নেতা যখন আওয়ামী লীগ ও ডলার রাজনীতির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম যোগাযোগ দেখাতে চান এবং নাটকের বিশেষ বিশেষ দৃশ্যে ইউসুফ আবদুল্লাহ্ হারুণ কিংবা মিয়া মমতাজ দৌলতানা বা নূর খানকে টেনে আনেন, তখন বিস্মিত হই না।'

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী তাঁর লেখায় শুধু নিজেই মুজিব বিরোধী মন্তব্য করতেন না, অনেক সময় অন্যের সঙ্গে আলাপের কিছু অংশও তুলে দিতেন তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে। উল্লেখিত কলামের এক পর্যায়ে তাঁর এক বন্ধুর মন্তব্য তুলে ধরেছেন এভাবে, 'নিজে প্রধানমন্ত্রী হলে শেখ সাহেব ডিক্টেটরী মনোভাবের দরুন নিজের হাতে স্বাভাবিক ক্ষমতার চেয়েও বেশি ক্ষমতা রাখবেন এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেছেন এই ধুয়া তুলে কাগজে-পত্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেখিয়ে পূর্ব বাংলায় এমন জ্বি-হুজুর মার্কা দলীয় মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতায় বসাবেন, যারা ভুলেও কখনো কেন্দ্র ও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের বাইরে পা ফেলতে সাহস করবেন না।'

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী আজকাল লিখে থাকেন, আওয়ামী লীগ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর শেখ মুজিবের হাতে একটি সংগ্রাম ও দেশপ্রেমিক দলে পরিণত হয়েছিল ('যায়যায়দিন' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। তিনি এমন মন্তব্যও করেছেন, আওয়ামী লীগ ছাড়া দেশে অন্য কোন দলেরই গণভিত্তি নেই। অথচ ঠিক উল্টা কথা লিখেছেন ১৯৭০ সালের ১৮ ডিসেম্বর 'পূর্বদেশ'-এ। সে দিন 'তৃতীয় মত'-এর এক পর্যায়ে তিনি লিখেছেন, 'পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের কোন গণভিত্তি নেই বা দলীয় জনপ্রিয়তা নেই। এই দলের একমাত্র মূলধন দলের নেতা শেখ মুজিবের বিপুল জনপ্রিয়তা। শেখ মুজিব যদি আওয়ামী লীগ থেকে সরে দাঁড়াতেন, তাহলে দলের একজন প্রার্থীও ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তার জোরে নির্বাচনে জয়ী হতে পারতেন কিনা সন্দেহ।'

www.nagorikpathagar.org

আরেক পর্যায়ে তিনি লিখেছেন, 'প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত, অপমানিত এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের অর্থ দানে অসমর্থ জার্মান জাতিকে হিটলার ব্রিটিশ বিরোধী তীব্র জাতীয় ভাবাবেগ দ্বারা তার পশ্চাতে জড়ো করেছিলেন এবং আহ্বান জানিয়েছিলেন, তোমরা আমাকে ক্ষমতা দাও, আমি তোমাদের হৃত অধিকার ও মর্যাদা শুধু ফিরিয়েই দেব না, বিশ্বের বুকে জার্মান জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবো।' আমি শেখ সাহেবকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করি না। কিন্তু এবারের নির্বাচনে শেখ সাহেব এই একই কথা অন্যভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁকে ভোট দেয়ার অর্থই বাংলার স্বাধিকার অর্জন। কেবল ব্যালটের জোরে তিনি পূর্ব বাংলার হৃত অধিকার ফিরিয়ে আনবেন। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের অধিকার ও শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালি গণমানসে যে তীব্র ভাবাবেগ পুঞ্জীভূত হয়েছে, তিনি তাকে উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনায় রূপান্তরিত হতে সাহায্য করেছেন। এবারের নির্বাচনেও তাঁর বড় স্লোগান ছিল, 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' এবং 'জয় বাংলা'। বাংলার মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করতে এবং তাঁর ওপর অখণ্ড ও অকুণ্ঠ আস্থা স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে।'

এ পর্যায়ে গাফ্ফার চৌধুরী সংসদীয় ধারায় বিশ্বাসী বামপন্থীদের সমালোচনা করেছেন যে, তারা 'জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্রোতকে আওয়ামী লীগের মধ্যপন্থী সুবিধাবাদের খপ্পর থেকে মুক্ত করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে না এনে জয় বাংলার পরিবর্তে জয় সর্বহারা স্লোগান দিয়েছে।

আরেক পর্যায়ে তিনি লিখেছেন, 'শেখ মুজিবের পশ্চাতে বাংলাদেশের মানুষের সর্বসম্মত সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও তিনি নির্বাচনী যুদ্ধে তাদের সর্বসম্মত রায় পেয়েছেন এবং তাদের আস্থার অধিকারী হয়েছেন। এমন কি যারা তাঁকে বা তাঁর দলকে পছন্দ করেন না, এমন বিপুল সংখ্যক ভোটদাতাও অনন্যোপায় হয়ে তাঁর দলকে ভোট দিতে বাধ্য হয়েছেন।'

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বাপর সময়গুলোতে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী তাঁর লেখায় যা বিশেষভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে, শেখ মুজিব উগ্র জাতীয়তাবাদীদের ওপর নির্ভর করে জনপ্রিয়তা অর্জন করছেন এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ কোন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠেনি। ব্যক্তির জনপ্রিয়তাই আসল বস্তু। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'তৃতীয় মত'-এর আরেকটি অংশ তুলে ধরছি, তাতে তিনি লিখেছেন, 'অপর জাতিসত্তার প্রতি প্রচ্ছন্ন অথবা প্রকাশ্য বিদ্বেষকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ, তার মহাঅকল্যাণকর দিক রয়েছে। আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশ এবং তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য কতোটা আগ্রহী ও সংগ্রামী উদ্যোগ গ্রহণের

www.nagorikpathagar.org

পক্ষপাতী, তা আমি জানি না। আপাতত যে বাঘের পিঠে শেখ মুজিব আরোহী হয়েছেন, তা কিছুটা জাতি-বিদ্বেষকেন্দ্রিক জাতীয়তা। এর হিংস্র নখর এখনো লুক্কায়িত।'

জনাব গাফ্‌ফার চৌধুরী নিজেই কি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন? যুদ্ধ শুরুর পাঁচ মাস পর ভারতে গিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজ পাওয়ার আগে তাঁর ভূমিকা কি ছিল? প্রখ্যাত সাংবাদিক শফিকুল কবির তাঁর 'টিকাটুলী থেকে পিকাডেলী' গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন, '৭০-৭১ সময় আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর কলকাতায় অবস্থান সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহার করেন, তা প্রকাশযোগ্য নয়... গুণী গাফ্‌ফার চৌধুরী পূর্বদেশের তৃতীয় মত চাপা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে চতুর্থ কৌশলে বঙ্গবন্ধুর মন জয় করতে পেরেছিলেন (পৃঃ ৪১)। জনাব চৌধুরীর জাদুকরী কলমের ডিগবাজী কিন্তু পরবর্তীকালেও থেমে থাকেনি। ১৯৮৮ সালে ইত্তেফাকের সাংবাদিক শফিকুল কবির লন্ডনে গিয়ে মহা ধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি সে কথা বর্ণনা করেছেন তাঁর প্রাগুক্ত গ্রন্থে! তিনি লিখেছেন, 'চা খেতে খেতে খান হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বলতে পারেন আপনাদের যশস্বী সাংবাদিক গাফ্‌ফার চৌধুরী আসলে কাদের লোক?'

'খানের কথা শুনে আমি নির্বাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার অবজ্ঞা অনুভব করেই বোধ করি খান বললেন, আপনি যদি গভীরভাবে খোঁজ-খবর নিতে যান, শুনতে পাবেন আওয়ামী লীগ বলছে গাফ্‌ফার চৌধুরী আমাদের লোক। আওয়ামী লীগ-চ্যুত বাকশাল, যারা আজকে বঙ্গবন্ধু পদক দিচ্ছে তারাও বলছে চৌধুরী আমাদের লোক। লন্ডনে জাতীয় পার্টির কুতুবদের সঙ্গে যদি একান্তে আলাপ করেন শুনবেন তারাও বলছে, এ্যাংগ্রী সিলেটীদের সাইজ আপ করার জন্য আমরাই এই বিশিষ্ট সাংবাদিককে লালন-পালন করে রাখছি। আর বিএনপি'র লন্ডনী নেতারা তো প্রকাশ্যেই বলে বেড়ায়, যে যাই বলুক-গাফ্‌ফার ভাই আমাদের লোক। (পৃষ্ঠা-৩৯)।

শফিকুল কবিরকে খান আরো বলেন, 'দেশে তিনি কি ছিলেন আমি বলতে পারব না। তবে লন্ডনে গত চৌদ্দ বছর ধরে তাঁকে দেখছি। এখানেও তাঁর ভক্তের সংখ্যা অনেক। আবার ভক্তরাই পশ্চাতে বদনাম রটায়। (পৃষ্ঠা ৩৯-৪০)।

১৪ই অগাস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে তৃতীয় মতের অধিকারী গাফ্‌ফার চৌধুরী ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট অতিক্রম করে কুমিল্লা বর্ডার দিয়ে ওপারে গিয়ে সুরুত বদল করে ফেলেন। কিন্তু ভাবতে এখনো আমার বিস্ময় লাগে, কত

www.nagorikpathagar.org

আগাছা-পরগাছা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে তালগাছ-শালগাছের রূপ ধারণ করল। কিন্তু গাফ্ফার চৌধুরীর মতো একজন গুণী লোক কলকাতায় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের আশ্রয় পেলেন না। এমনকি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রেও ঠাঁই হলো না তাঁর। নিন্দুকেরা বলে, হামিদুল হক চৌধুরীর এডভাইসে পাকিস্তানের এজেন্ট হয়ে গাফ্ফার চৌধুরী ইন্ডিয়ায় প্রবেশ করেছিলেন। এই সন্দেহের কারণেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও সেই সময় তাঁকে এড়িয়ে যেত। কিন্তু বাতাস বুঝে নৌকার পাল খাটানোয় ওস্তাদ গাফ্ফার চৌধুরীকে ঠেকায় সাধ্য কার? কলকাতার আনন্দবাজার গ্রুপে 'ভগবানের কৃপায়' ঠাঁই পেয়ে গেলেন তিনি। নিন্দুক আর সন্দেহভাজন বন্ধুদের মুখে থাপ্পড় মেরে কলম ঘুরিয়ে ধরলেন অসীম প্রতিভাধর তৃতীয় মতের খ্যাতিমান সাংবাদিক। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও আপসহীন সংগ্রামের কথা মীরা বাঈয়ের ভজনের মতো এমন দরদ দিয়ে আনন্দবাজারে লিখতে থাকেন যে, কলকাতার তুলসীপাতায় উলু উলু ধ্বনির শোর পড়ে গিয়েছিল। তৎকালীন চার ছাত্রনেতার এক নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী মুক্তিযুদ্ধের পুনর্বাসন ও শনৈ শনৈ উন্নতি সম্পর্কে শফিকুল কবির মিঃ খানের বরাত দিয়ে লিখেছেন, '৭৫-এর ১৫ অগাস্টের পর সেই দাবানলের সময় ইষ্ট লন্ডনে প্রথম শোনা গেল আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর নাম। দেশের একজন বড় সাংবাদিক। বঙ্গবন্ধু খরচপত্র দিয়ে স্ত্রীর চিকিৎসা করানোর জন্য তাঁকে লন্ডনে পাঠিয়েছিলেন। সিলেটি কমিউনিটির লীডার মওলানা ভাসানীর আদর্শের পতাকাবাহক তাসাদ্দুক আহমদ ইষ্ট লন্ডনে গাফ্ফার চৌধুরীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন, প্রবাসী সিলেটিরা তখন কিভাবে গাফ্ফার চৌধুরীকে আপন করে নিয়েছিল। জাস্টিস আবু সাঈদ চৌধুরী থেকে শুরু করে দর্জি কারখানার সিলেটি শ্রমিকরা পর্যন্ত গাফ্ফার চৌধুরীর সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিল। তিনি বঙ্গবন্ধুর কথা কাতর স্বরে বলতেন আর সিলেটিদের মন গলাতেন। দেশে ফিরে গেলে তাঁর বিপদ হতে পারে, এ কারণ দেখিয়ে লন্ডনে পলিটিক্যাল এসাইলাম চাইলেন, পেয়েও গেলেন। এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে দেশ থেকে তাঁর দুই মেয়ে ও এক পুত্রকেও নিয়ে আসা হলো। তারপর একদিন লন্ডনে ইন্ডিয়ান দূতাবাস থেকে গাফ্ফার চৌধুরীর কাছে এক সুখবর এল। গাফ্ফার চৌধুরী গেলেন ইন্ডিয়ান দূতাবাসে। প্রথম কিস্তিতে নগদ পাঁচ হাজার পাউন্ড আর দিল্লি থেকে পাঠানো শেখ হাসিনার ছোট্ট একটি চিঠি। চিঠিতে মাত্র কয়েকটি শব্দ লেখা ছিল, 'চাচা, যদি পারেন বাবার স্মৃতিকে লন্ডনে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন।' তারপর ইন্ডিয়ান দূতাবাসের নিয়মিত অর্থ সাহায্যে গাফ্ফার চৌধুরী 'বাংলার ডাক' পত্রিকা প্রকাশ করেন।' (পৃষ্ঠা : ৪১-৪২)। .... গাফ্ফার চৌধুরীর নামের জোরে 'বাংলার ডাক' ভালই চলছিল।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু বছর দুই পার না হতেই হঠাৎ একদিন 'বাংলার ডাক' বন্ধ হয়ে গেল! এ নিয়ে তখন লন্ডনে নানা কানা-ঘুষা শোনা গেছে। কেউ বলেছে, পাকিস্তানি দূতাবাসের সঙ্গে (হামিদুল হক চৌধুরীর প্রয়োজনে) গাফ্ফার চৌধুরীর গোপন যোগসূত্রের খবর জানার পর ভারতীয় দূতাবাস অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেয়। আবার কেউ বলেছে, পত্রিকায় খারাপ ভাষায় লিখলেও দেশে ফিরে যাবার জন্য জিয়াউর রহমানের সঙ্গে তৃতীয় সূত্রে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিলেন। অতঃপর 'বাংলার ডাক'-এর হাকডাক নিশ্চুপ হয়ে যায়। (পৃষ্ঠা-৪২)।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী বাংলাদেশে ফিরে তাঁর দেড় যুগের অজ্ঞতা বা অন্য কোন 'বিশেষ কারণে' যা লিখে চলেছেন, বাকশাল ঘরানার বুদ্ধিজীবীরা এগুলো অনেক আগেই বকে ও লিখে গেছেন। বরং এখন সে সব ভুল কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন কেউ কেউ। দেশে থেকেও জনগণের মূল স্পন্দনের সঙ্গে যোগাযোগ রহিত বুদ্ধিজীবীদের বাকশালী অংশটি তাদের অক্ষমতাজনিত ঈর্ষাটি মাঝে মাঝে প্রজ্বলিত রাখছেন বটে, কিন্তু তারাও জানেন, প্রকৃত সত্যটি কি। কিন্তু গাফ্ফার চৌধুরী বাস্তবতার নবতর উপস্থিতি ও বিন্যাসটি উপলব্ধির ধারে-কাছে না গিয়ে পুরনো ব্যবস্থাপত্রটিই দিয়ে যাচ্ছেন জাতিকে, যে ব্যবস্থাপত্রের অনেক ওষুধই বাজারে আর পাওয়া যায় না।

বাকশাল ঘরানার বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে গাফ্ফার চৌধুরীর অন্তত মিলটি এমনই প্রবল যে, বাংলাদেশে নবপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রটি তার পছন্দ হয়নি। অপছন্দের কারণ চর্চার ক্রটি নয়, গাফ্ফার চৌধুরীর পছন্দের লোকেরা ক্ষমতায় যেতে পারেননি। অন্তর্জ্বালাটা এখানেই। একদা তিনি বলেছিলেন, 'সৈনিকের দেশে' তিনি আর ফিরে যাবেন না। ইঙ্গিত করেছিলেন জিয়াউর রহমানকে। সাপ্তাহিক বিচিত্রার ভাষায়, লন্ডনে বসে তখন তিনি লন্ডন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, এ জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনে জিয়া প্রতিষ্ঠিত বিএনপি যখন ক্ষমতায়, তখনই তাঁকে দেশে আসতে হলো। কিন্তু বিএনপি'র সরকারকে যে মেনে নিতে পারেননি, তার প্রমাণ তিনি প্রতিদিনই রেখে চলছেন।

আমরা জানি না, জনাব চৌধুরীর সাম্প্রতিক মিশনটি কি। স্ববিরোধী, পরস্পর বিরোধী ও জনগণকে অসম্মানিত করে লেখার পেছনকার উদ্দেশ্যটি কি? শফিকুল কবিরের অনুমান, তিনি কোন দূতের আগমনী বার্তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শফিকুল কবির তার প্রাগুক্ত গ্রন্থে আরো লিখেছেন, 'আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন, একজন স্বনামধন্য সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং উঁচু দরের ভাড়াটে লেখক। মোশতাক সরকার, জিয়া সরকার

www.nagorikpathagar.org

এবং হাল আমলের এরশাদ সরকার (১৯৮৮ সালে লেখা, তখন এরশাদ ক্ষমতায়-আ, মু) গাফ্ফার চৌধুরীর বিরুদ্ধে কোন হুলিয়া জারি করে রেখেছেন, এমন কোন তথ্য আমার জানা নেই। হামিদুল হক চৌধুরী ও গোলাম আযমের মত বিতর্কিত রাজনৈতিক চরিত্রের ব্যক্তিরা দেশে ফিরে এসে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিয়েছেন। কিন্তু জোয়ার ভাটার স্রোতধারায় মিশে যাওয়াই যার স্বভাব, সেই চতুর চালাক গাফ্ফার চৌধুরীর দীর্ঘ চৌদ্দ বছরেও কেন দেশে ফিরে আসলেন না। আদৌ ফিরে আসবেন কিনা, ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নিয়ে কোন তুরুপের তাস হাতে রেখে বাংলাদেশের জ্যাক ধরার আশায় আছেন, এসব অনেক প্রিয়-অপ্রিয় কাহিনী আমি আর বলতে চাই না। (পৃষ্ঠা-৫৩)।

সিরাজ সিকদারকে হত্যা করার সময় গাফ্ফার চৌধুরী লন্ডনে ছিলেন। হত্যার ১১ দিন পর লন্ডন থেকে একটি পাঠানো লেখা জনপদ-এ ছাপা হয় ১৩ই জানুয়ারি। প্রথম পৃষ্ঠায় 'সিরাজ সিকদারের মৃত্যু এবং তারপর' শিরোনামের লেখায় তিনি লিখেছেন,

'লন্ডনে বসেই প্রথমে খবরটা পেয়েছি। রূপকথার নায়ক কমরেড সিরাজ সিকদার পুলিশের হাতে ধৃত হয়ে পলায়ন করার চেষ্টা করায় নিহত হয়েছেন। অনেক প্রবাসী বাঙালির মতো আমিও প্রথমে খবরটা বিশ্বাস করিনি। ভেবেছি, এটা একটা পুলিশি স্টান্ট। তারপর ধীরে ধীরে যখন খবরের কাগজে ছবি দেখলাম, আরো খবর শুনলাম, তখন বিশ্বাস করতে হলো- না কমরেড সিরাজ সিকদার আর নেই। পশ্চিমবঙ্গের কমরেড চারু মজুমদার এবং বাংলাদেশের কমরেড সিরাজ সিকদার দু'জনেই একই ভাগ্য বরণ করে নিলেন। অর্থাৎ পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীনই দু'জনকে মৃত্যুবরণ করতে হলো। দু'জনেরই বিপুল সম্ভাবনাময় বিপ্লবী জীবন, কিন্তু দু'জনেরই অবধারিত পরিণতি ব্যর্থতা।'

'সিরাজ সিকদারের মত ও পথের সঙ্গে আমি একমত নই। সশস্ত্র বিপ্লবে আমার আস্থা রয়েছে...। সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি উপকথার যুগের অবসান হলো। জীবিত সিরাজ সিকদারকে আমি দেখিনি। কিন্তু মৃত সিরাজ সিকদারকে আমি শেষ শ্রদ্ধা জানাই।'

অবশ্য গাফ্ফার চৌধুরী তার পরের দিনই আবার সরকারকে 'ম্যানেজ' করার জন্য আরেকটি লেখা ফাঁদেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ জানুয়ারি জনপদ-এ তিনি আওয়ামী লীগের জরুরি অবস্থা ঘোষণাকে সমর্থন জানিয়ে লিখেন, 'বিদেশে বসে জরুরি অবস্থা ঘোষণাকে যেমন সমর্থ জানিয়েছি, দেশে এসেও একই কারণে সমর্থন জানাব যে, সরকারের কঠোর হওয়া দরকার। ... আমার প্রার্থনা, বঙ্গবন্ধু এবার যেন সত্যিই কঠোর হন।'

www.nagorikpathagar.org

শেখ মুজিবকে কঠোর হওয়ার প্রার্থনা জানানোর মাত্র ১০ দিন পর তিনি ক্লান্ত হয়ে গ্রাম্যতা ও বিকারের হাত থেকে মুক্তি চাইলেন। কি বিচিত্র! আজ যখন গাফ্ফার চৌধুরী প্রত্যাখ্যাত বাকশালের গুণকীর্তন করেন, তখন আমাদের ন্যায্য সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, এর রহস্য কি?

কিন্তু প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে না, পছন্দ করে না শূন্যতা। আঠার বছরে প্রকৃতিই নগ্ন করেছে গাফ্ফার চৌধুরীকে। ঘটনা-তৎপরতার মধ্যদিয়ে প্রমাণ করেছে, একজন মেধাবী মতলববাজ ও ভাড়াটে লেখকের স্বরূপ। চাঁদায় যার জীবন চলে তার সমালোচনার অধিকার থাকে না, তাকে সমঝে চলতে হয় পদে পদে। ভেক পাল্টাতে হয় বার বার। জীবিকা যার শ্রমে-ঘামে সিক্ত নয়, সে কখনো সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, সত্যের ভান করতে পারে মাত্র। আর যে মস্তিষ্ক ভাড়া খাটে, সে পণ্য করে তোলে সব কিছুকে। তাঁর শ্রদ্ধাকে, ঘৃণাকে, গ্রহণীয়কে, বর্জনীয়কে। তাঁর সত্য সব সময়ই স্বার্থের অনুগামী। গাফ্ফার চৌধুরীর অতুলনীয় মেধা-মনীষা আক্রান্ত হয়েছে সেই স্বার্থের দ্বারা। গাফ্ফার চৌধুরীর ট্রাজেডি এখানেই। কিন্তু তাঁর এই ট্রাজেডি তেমন বড় মাপের ট্রাজেডি নয়, যা দুঃখ-ভারাক্রান্ত করে তুলতে পারে। বরং বড়জোর উদ্রেক করতে পারে করুণার। একটি মহীরুহের পতনকে এভাবেই পর্যবেক্ষণ করছে চলতি বংশধর। যাদের গ্রাম্যতা ও বিকারের কাছে আশ্রয় না নেয়ার জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছেন, সম্ভবত তার প্রভু সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করেননি। তাই চৌধুরী কি-ই বা করতে পারতেন।

চৌধুরী শুধু নিজ স্বার্থের স্বজন। যেখানে স্বার্থ নেই, চৌধুরী সেখানে নেই।

www.nagorikpathagar.org

ডক্টর আহমদ শরীফ

(জন্ম ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯২১-মৃত্যু ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯)

ডঃ আহমদ শরীফ। ডাক নাম লেধু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন গবেষক, কলামিস্ট, সভাপতি-স্বদেশ চিন্তা সংঘ, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জন্ম নেয়া ঘাদানিকের তথাকথিত গণআদালতের ২৪ জন গণআদালতীর অন্যতম সদস্য। জন্ম : ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯২১ সাল। জন্মস্থান : চট্টগ্রামের পটিয়া থানার সুচক্রদন্ডী গ্রাম। পিতা আব্দুল আজিজ, মা সিরাজ খাতুন। পিতা ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের করণিক। ডঃ আহমদ শরীফ প্রথমে চট্টগ্রামের আলকরণে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরে পটিয়া ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন ও ১৯৩৮ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। তারপর চট্টগ্রাম কলেজিয়েট কলেজে ভর্তি হন এবং ৪ বছর পর বিএ পাস করেন। ১৯৪২-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ-তে ভর্তি হন ও ১৯৪৪ সালে দ্বিতীয় শ্রেণীতে চতুর্থ হয়ে এমএ পাস করেন। এরপর ১৯৪৫-৪৮ পর্যন্ত লাকসামের পশ্চিমগাঁও নওয়াব ফয়জুন্নেসা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৭ সালের ৭ই নভেম্বর ফেনীর সালেহা মাহমুদের সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৯৫৩-এর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা সহায়ক হিসাবে নিয়োগ পান। মাঝে মাঝে ২/৪টি ক্লাস নিতেন। ১৯৬৭-এর এপ্রিলে ১৬শ' শতকের প্রখ্যাত কবি সৈয়দ সুলতান, তাঁর যুগ ও তাঁর রচনাবলী বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। বাংলা একাডেমী থেকে মধ্যযুগের অবহেলিত কবি ও মুসলিম সাহিত্যিকদের পুঁথি সম্পাদনা ও প্রকাশনায় নিয়োজিত ছিলেন। স্বরচিত তার গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় ৪০টি। ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ডঃ আহমদ শরীফের অনার্স ডিগ্রি ছিল না। বিএ-এর পর এমএ পাস, তাও দ্বিতীয় বিভাগ। কয়েক বছর বেকার থাকার পর ঢাকার জগন্নাথ কলেজে

www.nagorikpathagar.org

পরীক্ষামূলকভাবে বাংলা বিভাগের প্রভাষক নিযুক্ত হন। কিন্তু কোন কৃতিত্ব দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি অপসারিত হন। পরবর্তীতে তাঁর চাচা আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের প্রচেষ্টায় তৎকালীন পাকিস্তানের বেতারমন্ত্রী জনাব নাজমুর রহমানের অনুরোধে রেডিও পাকিস্তানে অস্থায়ীভাবে প্রোগ্রাম এসিস্ট্যান্ট হিসাবে নিয়োগ পান। এখানেও তিনি বেশি দিন টিকতে পারেননি। পুনরায় তাঁর চাচা আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদই আহমদ শরীফকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দেয়ার শর্তে তাঁর সংগৃহীত বিশাল পুঁথির ভান্ডার বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। এ দানকৃত পান্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট হিসাবে নিয়োগ পান আহমদ শরীফ। এসব পান্ডুলিপি সম্পাদনা করে তিনি বাংলা বিভাগের লেকচারার হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন।

ডঃ আহমদ শরীফ পাকিস্তান আমলে ছিলেন মুসলমানদের একজন স্বজন। এমনকি ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর ভূমিকা ছিল কট্টর পাকিস্তানবাদী। ১৬ই ডিসেম্বরের পর তিনি 'যখন যেমন তখন তেমন' ভূমিকা পালন করেন। অতীতকে ভুলে যান। অতীতকে ভুলে গেলেও অতীতের কোন কোন ঘটনা স্মৃতিচারণে এসে পড়তো। ডঃ হুমায়ুন আজাদ ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডঃ আহমদ শরীফের যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, সে সাক্ষাৎকার ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ সালের সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রচ্ছদ কাহিনী হিসাবে প্রকাশিত হয়। সেই সাক্ষাৎকারে ডঃ আহমদ শরীফ বলেছিলেন, "চট্টগ্রাম কলেজে যখন পড়ি, তখন মুসলমান ছাত্রদের আমি একজন নেতা ছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার আগে বড় ভাই বললেন, 'আমাদের মত নিম্নবিত্তের মানুষের রাজনীতি করা সাজে না। বড় লোকেরই ওই সব সাজে। বড় লোকের ছেলেরাই নেতা হয়।' একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন, 'মতিলালদের ছেলে জওহর লালেরা কিছু না করেও নেতা হন। অন্যরা হ্যান্ডবিল বিলি করে, চেয়ার টানে। কাজেই তুমি আর পলিটিক্স করো না।' এটা বলার একটা কারণ ছিল। আমাদের বিএ পরীক্ষার আগে চট্টগ্রামে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বোমা পড়ে আর আমরাও বায়না ধরি যে, টেস্ট পরীক্ষা দেব না। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা নেবেই। ফজলুল হক সাহেব তাঁর কয়েকজন মন্ত্রী নিয়ে এসেছিলেন নোয়াখালী। আমরা সেখানে গেলাম। তিনটি হিন্দু ছেলে ও আমি। আমি ছিলাম নেতা। অবশেষে কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে আপোস করেন, আমরা শুধু এক পেপার পরীক্ষা দেব।

www.nagorikpathagar.org

আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলাম, তখন কোন নির্বাচনে অংশ নিলাম না, কিন্তু অভ্যাস দোষে কর্তা ব্যক্তিদের মাঝে একজন ছিলাম।"

লক্ষণীয় দিকটি হচ্ছে এই, তাঁর এই জবাবের মধ্যে অবচেতনভাবে দুবার মুসলমানিত্বের কথা এসেছে। একবার এসেছে চট্টগ্রাম কলেজের মুসলমান ছাত্র নেতা হিসাবে। অন্যবার এসেছে শেরেবাংলার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় হিন্দু তিনজন ছাত্র থেকে নিজেকে পৃথক পরিচয় দেয়ার ক্ষেত্রে।

তিনি গর্ব করে বলতেন, 'আমি নাস্তিক।' কিন্তু তিনি আস্তিক মুসলমান কবি সৈয়দ সুলতানের ওপর গবেষণা করেছেন। তাঁর রচনার ওপর থিসিস লিখে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন। বাংলা একাডেমী থেকে মধ্যযুগের অবহেলিত কবি ও মুসলিম সাহিত্যিকদের পুঁথি সম্পাদনা করেছেন, প্রকাশনায় সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। এসব তো স্বজনেরই লক্ষণ।

ডঃ আহমদ শরীফের রচনার কিছু উদ্ধৃতি দেয়া যাক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর এমনকি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিজেকে একজন নাস্তিক বলে পরিচয় দিতে উৎসাহী ছিলেন এবং যাবতীয় ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের বিরোধিতায় ছিলেন সোচ্চার। ইসলামের অনুসারী মুসলমানদের নিন্দা জ্ঞাপনে ও তাদের হীন বর্ণে চিত্রিত করতে 'সাহসী' ভূমিকা পালন করলেও পাক আমলে তার ভূমিকা ছিল অন্যরূপ। তার সে সময়ের লেখার উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'ইসলামে বিশ্বাসের (ঈমানের) সঙ্গে সৎ-কর্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যা তোমার নিজের জন্য কাম্য নয়, তা তোমার ভাইয়ের জন্যও কামনা করো না। বেঁচে থাক, বাঁচতে দাও, ভাল চাও, ভাল কর। এই হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা। কোরআনের সর্বত্র পার্থিব জীবনে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় পারস্পরিক ঘরোয়া ও সামাজিক ব্যবহারের বিধি-নিষেধই নির্দেশিত হয়েছে। অতএব ইসলাম মুখ্যত ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবন-বিধি (Code of Life), জেহাদও এ বিধির অন্যতম অঙ্গ। পার্থিবতাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য ধর্মের তুলনায় এর শ্রেষ্ঠত্বও এখানেই।' [দ্রঃ জেহাদের স্বরূপ, আহমদ শরীফ, সওগাত, শ্রাবণ, ১৩৬৮] অন্যত্র ডঃ আহমদ শরীফের বক্তব্য : 'মানুষের মনুষ্যত্ব স্বীকৃতি পেল, আল্লাহ মানুষকে শক্তিও দিয়েছেন। ধর্ম শুধু কলের প্রত্যঙ্গ নয়, মানুষ এক একটি সত্ত্বা, আল্লাহর প্রতিনিধি মানুষ। 'নিয়তি' নেই, শুধু 'নিয়ম' আছে। তার কারণ, নিরপেক্ষ কার্য অসম্ভব। আল্লাহ শুধু দুনিয়ার অন্য যাবতীয় বস্তুর মালিক নন, মানুষেরও মালিক। গোটা দুনিয়া সৃষ্টিরই (জড়জীব), বিহার-বিলাস-ভোগ ক্ষেত্র

www.nagorikpathagar.org

শুধু মানুষের একার নয় এবং জড়-জীব পরস্পর নির্ভরশীল। অতএব আদর্শ হোক Live and let live (বেঁচে থাকো এবং বাঁচতে দাও)। ধর্ম হোক বিবেক-নির্দেশ ও যুক্তিবোধ গ্রাহ্য। আজকের মানুষের প্রাণের কথাই এই।' [দ্রঃ বিশ্বের নাগরিক, আহমদ শরীফ, সওগাত, আশ্বিন, ১৩৬৮। 'আমাদের বাংলা ভাষায় স্বকীয় আদর্শ সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে, আদর্শ হবে কোরআনের শিক্ষা। আর তা হবে মুসলমান ঐতিহ্যানুগ আর বিষয়বস্তু হবে ব্যক্তি বা সমাজ অথবা বৃহদার্থে জগৎ জীবন। এভাবে আমাদের সাহিত্য ও জাতীয় জীবন গড়ে উঠবে (মাসিক মোহাম্মদী : পৌষ ১৩৫৮ বাংলা, ডঃ আহমদ শরীফ, তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারায় হিন্দু প্রভাব' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য]।

'পুঁথির ফসল' নামক বইয়ের ভূমিকায় ডঃ আহমদ শরীফ লিখেছিলেন, 'আঠারো-উনিশ শতকী দোভাষী সাহিত্য আমাদের নগর-বন্দর এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন-মানসের তথা জীবন চর্চার প্রতিচ্ছবি ও প্রতিভু। এই সাহিত্যই উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে আজ অবধি শতকরা নব্বইজন বাঙালি মুসলমানের মনে জাগিয়ে রেখেছে ইসলামী জীবন-ঐতিহ্য-চেতনা। সাহিত্য রচনার শেষ শব্দ যদি সমাজকল্যাণ হয়, তাহলে মানতেই হবে-দোভাষী সাহিত্য গত একশ' বছর ধরে অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত মুসলমানের জগত ও জীবন-ভাবনার নিয়ামক (পুঁথির ফসল : আহমদ শরীফ, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬ ইং, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫।

পাকিস্তানী আমলে ডঃ আহমদ শরীফ তাঁর বহু নিবন্ধে ইসলামের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেছেন, আল্লাহর মহিমারও গুণগান করেছেন। 'ধর্মীয় গোঁড়ামি' ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বললেও সে সময়ে তিনি কখনও ধর্মকে সরাসরি অস্বীকার করেননি এবং একালের মত নিজেকে আস্তিক্য বিরোধী বলেও আখ্যায়িত করেননি বরং জাতীয়তা এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যে ধর্মীয় আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ এবং বিশেষভাবে ইসলামের প্রভাব গভীর, সে কথাও তিনি তাঁর অনেক নিবন্ধে বলেছেন। বস্তুত, ডঃ আহমদ শরীফ ও তাঁর সগোত্রীয় বুদ্ধিজীবী অনেকের চিন্তাধারাও মূল্যবোধের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটেছে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর, ১৯৭২ সালে 'সিক্যুলারিজম' ও 'বাঙালি জাতীয়তা'কে সংবিধানের চার মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করার প্রেক্ষাপটে। অভিযোগ রয়েছে, মৌলভী ফরিদ আহমদকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর লালবাগের এক বাসা থেকে তিনিই ধরিয়ে দেন। অথচ এই ফরিদ আহমদই তাকে সংগ্রামের ৯ মাস আগলিয়ে রেখেছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বরের পর তিনি অন্য মানুষ হয়ে গেলেন।

www.nagorikpathagar.org

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এবং ইসলামের আদর্শকে সামনে রেখে। তাই সে সময়ের প্রেক্ষাপটে দ্বিজাতিতত্ত্বের ও ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য এবং ইসলামী সংস্কৃতির মহিমা গুণগানে অনেকে আত্মনিয়োগ করেন। এমন কিছু বুদ্ধিজীবীকে দেখা যায়, যারা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর 'সেক্যুলারিজম' ও 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী'-এর জয়গানে মুখর হয়ে উঠেন। এমন কি কেউ কেউ এক কাঠি এগিয়ে গিয়ে 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' আর ধর্মীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের মুন্ডুপাত করেন। পাকিস্তানি আমলে 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র' ইত্যাদি গ্রন্থ ও এ জাতীয় অনেক প্রবন্ধ লিখে যারা বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র মুসলিম সাধনার ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, তাদের অনেকেই বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে কলম ধরেন এবং বাঙালি জাতীয়তা ও বাঙালি সংস্কৃতির প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। এমনকি 'মুসলিম সাহিত্য' 'মুসলিম সংস্কৃতি' ইত্যাদিকে 'সাম্প্রদায়িক' ব্যাপার বলতেও পিছপা হননি।

এস,এ, বিজয় তিলক-এর নিবন্ধ 'কায়েদে আযম প্রেরণাদায়ক আদর্শ' শিরোনামে ডঃ আহমদ শরীফ অনুবাদ করেন এবং তা পত্রিকায় প্রকাশ করেন। জিন্নাহ চরিত্রে তিনি প্রভাবিত না হলে নিশ্চয়ই নিবন্ধটি অনুবাদ করতেন না। নিঃসন্দেহে তাঁর সে সময়ের ভূমিকা ছিল স্বজনের ভূমিকা।

ডঃ হুমায়ুন আজাদের দৃষ্টিতে আহমদ শরীফ : ডঃ আহমদ শরীফের ছাত্র ডঃ হুমায়ুন আজাদ। শুধু ছাত্রই নন, সহকর্মীও ছিলেন। ডঃ হুমায়ুন আজাদ তাঁর শিক্ষক ও সহকর্মী ডঃ আহমদ শরীফ সম্পর্কে যা বলেছেন, তা পাঠকদের জন্য পেশ করছি। তিনি বলেন, ডক্টর আহমদ শরীফ অনন্য। এমন আর নেই, আর পাওয়া যাবে না পলিমাটির এই ছোট্ট বদ্বীপে। দ্বিতীয় নেই, তৃতীয় নেই, চতুর্থ নেই তাঁর। প্রতিবাদী তিনি, দেবতারা যেখানে ভয় পায়, তিনি সেখানে উদ্ধত শিরে উপস্থিত হন। তিনি বিদ্রোহী। সব রকম প্রথা সংস্কারের শৃঙ্খল ধরে খুব জোরে তিনি টান দিচ্ছেন কয়েক দশক ধরে। তাঁর মুক্তবুদ্ধি ও প্রথা বিরোধিতা আকৃষ্ট করেছে প্রগতিশীলদের। তাঁর কাছে দেশের সবচেয়ে পবিত্র স্থান শহীদ মিনার। সমাজতন্ত্রকে তিনি তাঁর আদর্শ হিসাবে গণ্য করেন। প্রচণ্ড ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী তিনি। কখনো তাঁকে মনে হয় একজন অভিজাত সামন্ত, কখনো মনে হয় পশ্চিমা বুর্জোয়া। কখনো মনে হয় শ্রেণীহীন বিপ্লবী, কখনো মনে হয় রোমান্টিক, আর কখনো মনে হয় নৈরাজ্যবাদী। তাই কোন বিশেষ সংঘের সঙ্গে খাপে খাপে মিলে যান না তিনি বরং তাঁকে খাপ না খাওয়া মানুষ

www.nagorikpathagar.org

বলে মনে হয় অনেক সময়। (কিন্তু ঘাদানিকদের সঙ্গে খাপে খাপ মিললেন কেমন করে এই প্রচণ্ড ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী লোকটি? এ প্রশ্ন আমার)।

প্রথা সম্মত ভদ্র লোকেরা অসৎ ও ভণ্ড। ডক্টর আহমদ শরীফ প্রথা সম্মত ভদ্রলোক নন। তিনি উচ্চ কণ্ঠে তর্ক করেন, উত্তেজিত হন, সরবে অসৎ ব্যক্তির নিন্দা করেন। রূঢ়ভাবে প্রতিবাদ করেন অন্যায়ের। প্রথাসম্মত ভদ্রতাকে ঘৃণা করে তিনি রোধ করতে চান সুবিধাবাদী ভদ্রতাকে। 'বেআদবি' নামে প্রবন্ধ লিখে স্তব্ধ করেন তিনি বিদ্রোহী বেআদবদের। কিংবদন্তীর বিপরীত ব্যাপারকে বলতে পারি 'ব্যক্তিত্ব', আর তা ব্যাপকভাবেই ধারণা করেন ডক্টর আহমদ শরীফ। (এটা তিনি কিভাবে ধারণ করেন, এ সম্পর্কে ডঃ হুমায়ুন আজাদ থেকে শুনুন) তিনি (ডঃ আহমদ শরীফ) উত্তেজিত হলে সারা ঘরে ঝড় বয়, ক্রুদ্ধ হলে চারদিকে বহু কিছু ভেঙ্গে পড়ার শব্দ শোনা যায়।

তিনি আধুনিক উজ্জ্বল পোশাক পরেন, ঝকঝকে জীবন-যাপন করেন। আধুনিক চিন্তা-ভাবনা করেন। তাঁর বাসায় যেয়ে আরো বিস্মিত হয়েছিলাম। সেই অল্প বয়সে ধারণা হয়েছিল, ডক্টর আহমদ শরীফ যেহেতু সমাজতান্ত্রিক, তাই তাঁর বাসা হবে দারিদ্র্যের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু ঢুকেই দেখি বিশাল ড্রইং রুম, উজ্জ্বল কার্পেট, দামি আসন, তৈজসপত্র। তাঁর নিজের আসনটি সুনির্দিষ্ট, যাতে একটি কলিং বেলের সুইচ পর্যন্ত লাগানো। বেল টিপলেই কোন না কোন পুরাতন ভৃত্য সাড়া দেয়। (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫, প্রচ্ছদ কাহিনী-পণ্ডিত ও বয়স্ক বিদ্রোহী ডক্টর আহমদ শরীফ-বাঙালি সংস্কৃতির কোন চিরস্থায়ী রূপ নেই)।

পাকা নাস্তিকের পাকা স্পষ্ট কথা

[রচনা-২রা মার্চ ১৯৮৫ ইংরেজি সাল]

মনে আর মুখে এক- এমন যে জন, তিনি আমার শত্রু হলেও তাঁকে শ্রদ্ধা করি। ডঃ আহমদ শরীফ সেই জাতের মানুষ। যার মন ও মুখ এক। তাঁর চিন্তাধারা আর জীবনধারার সঙ্গে আমার চিন্তাধারা ও জীবধারার আসমান-জমিন ফারাক। থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাই তাঁর স্পষ্টবাদিতার জন্য। সাপ্তাহিক বিচিত্রার প্রচ্ছদ কাহিনীতে ডঃ হুমায়ুন আজাদের উপস্থাপনায় ডঃ আহমদ শরীফকে মননে ও বচনে এবং নিখুঁত চরিত্র

www.nagorikpathagar.org

চিত্রায়নে নেকাব ছাড়া চেহারায় যেভাবে দেখলাম, এভাবে আমি আমার জীবনে খুব কম লোককে দেখেছি। আমি ডঃ আহমদ শরীফকে স্বরূপে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। মুখোশ ছাড়া মুখ দেখলে কার না ভাল লাগে। মুখোশওয়ালা মানুষ ধান্ধাবাজ।

আসল মুখ দেখলে প্রতারিত হবার ভয় থাকে না। শত্রুকেও ভাল লাগে, যদি তার মন ও মুখ সব সময় এক দেখা যায়। ডঃ আহমদ শরীফকে অরিজিন চেহারা-চরিত্রে আবির্ভূত হতে দেখে এ জন্যই মনের আনন্দে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। অবশ্য তাঁর পৈত্রিক নামের সঙ্গে ব্যক্তিগত চিন্তাধারার অমিল দেখে খুশি হইনি। এফিডেবিট করে নাম পরিবর্তন করলে আর কোন সন্দেহ থাকতো না।

মর্দের মর্দামী শুধু গায়ে-গতরেই নয় বরং স্পষ্টবাদিতা ও সাহসিকতায়ও। ডঃ আহমদ শরীফ তাঁর জীবন-দর্শন তথা বিশ্বাস নিয়ে লুকোচুরি খেলা খেলেননি। যা সত্য ও সঠিক মনে করেন, তা তিনি সাফ সাফ বলে দেন। তাঁর কথা কারো ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, সে পরোয়া তিনি করেননি। তাঁর 'ঈমানে' তিনি 'কামেল'।

ডঃ হুমায়ুন আজাদের উপস্থাপনায় ডঃ আহমদ শরীফের চরিত্রকে যেভাবে চিত্রায়ন করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, (ডঃ হুমায়ুন আজাদের ভাষায়) 'ডক্টর আহমদ শরীফ অনন্য, দ্বিতীয় নেই, তৃতীয় নেই, চতুর্থ নেই তাঁর।' আমিও বলি, তিনি 'পলিমাটির এ ছোট্ট বদ্বীপে' অনন্য বলেই মনে হয়। তবে অনেকে আছেন, তাদের মুখে মুখোশ রয়েছে বলে চেনা যাচ্ছে না। ডঃ আহমদ শরীফের মত সাহস সঞ্চয় করে কোন দিন যদি তারা মেহেরবানি করে মুখোশ খুলে ফেলেন, তাহলে আজ যিনি 'অনন্য', তিনি হবেন 'অন্যতম'। তবে এ পর্যন্ত ডঃ আহমদ শরীফ 'অনন্যই' আছেন। মুখোশ পরা প্রগতিশীলরা মুখোশ খুলতে পারলে সাধারণ মানুষ বড়ই উপকৃত হতো। তারা আসল-নকলকে সহজেই পরখ করতে পারতো। তিনি (ডঃ আহমদ শরীফ) বিদ্রোহী, সব রকম প্রথা-সংস্কার-শৃঙ্খল ধরে খুব জোরে নাকি কয়েক দশক ধরে ভীষণভাবে টানাটানি করছেন। কিন্তু এখনও এই টানাটানিতে কাউকে সহযোগিতায় পাননি। এ জন্য তিনি নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। করারই কথা। কাহাতক একা একা টানাটানি করা যায়। তাই মনে দারুণ হতাশা। এই হতাশা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য বিভিন্ন 'বাদ'-এর সংমিশ্রণ নিজের মধ্যে ঘটিয়ে আরো বেশি হতাশায় ভেঙে

www.nagorikpathagar.org

পড়ে অধিকতর বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। ডঃ হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, 'ভাববাদ-মানবতাবাদ-মার্কসবাদের এক বিক্ষুব্ধ সংমিশ্রণ ডঃ আহমদ শরীফ।' বিক্ষুব্ধ সংমিশ্রণ যে ঘটেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে তাঁর ছাত্র ও সহকর্মীর মন্তব্য হলো এই, প্রথাসম্মত ভদ্রতাকে তিনি ঘৃণা করেন। 'বেয়াদবি' নামে প্রবন্ধ লিখে স্তব্ধ করেন বিদ্রোহী বেয়াদবের। উত্তেজিত হলে সারা ঘরে ঝড় বয়। ক্রুদ্ধ হলে চারদিকে বহু কিছু ভেঙ্গে পড়ার শব্দ শোনা যায় (চায়ের কাপ, পিরিচ, বাসন ইত্যাদি)। বিক্ষুব্ধ মিশ্রণের প্রকাশ এভাবে ঘটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। বিভিন্ন জাতের কেমিক্যাল এক পাত্রে রেখে নিরন্তর নাড়াচাড়া করলে রি-অ্যাকশন হবেই। বাংলা ভাষায় যাকে বলে প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ার ধর্ম মেনে যারা চলেন, তারাই হন প্রতিক্রিয়াশীল বা রি-অ্যাকশনারী অর্থাৎ বিক্ষুব্ধ সংমিশ্রণ। একরূপে অপূর্ব দেখায়, বহুরূপে হতে হয় বহুরূপী। বহুরূপী মানেই অশান্তি আর সে যে কি মারাত্মক অশান্তি, তা শ্রীকান্ত উপন্যাসের বহুরূপীই মর্মে মর্মে টের পেয়েছে।

ডঃ আহমদ শরীফ এমন কি সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন, যা পাঠ করে আমি এত আনন্দিত হয়েছি? তিনি বলেছেন, তিনি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি কমিউনিস্ট। তিনি কোন ধর্মে বিশ্বাস করেন না। সকল ধর্মগ্রন্থকে তিনি মনে করেন 'ম্যানমেইড' (মানবরচিত)। তাঁর ভাষায়, 'নাস্তিক্যধারা জীবন দর্শনে আমি বিশ্বাসী। স্রষ্টা থাকতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্র থাকবে এমন কোন কথা নেই। স্রষ্টা থাকলেই তার উপাসনার প্রয়োজন আছে, তা আমি বিশ্বাস করি না। বিবাহ-পূর্ব যৌন মিলনে আমার কোন আপত্তি নেই। বরং এর জন্য শিক্ষার দরকার আছে। চলচ্চিত্রে চুমু খাওয়া দোষের হতে পারে না। মদ্য পান তো খারাপ জিনিস নয়। পরকালে আমি বিশ্বাস করি না।'

এমনভাবে নিজের বিশ্বাসের কথা স্পষ্ট ভাষায় ক'জনই বা বলতে পারেন? সমাজতন্ত্রী ঈমানে পাক্কা ঈমানদার তিনি। যারা সমাজতন্ত্রী হবার অনুশীলন করছেন বা সমাজতন্ত্রী অথবা কমিউনিস্ট হয়ে গেছেন বলে দাবি করেন, তাদের সমাজতন্ত্রী ঈমান কতটুকু পাকাপোক্ত হয়েছে, তা ডাঃ আহমদ শরীফের নাস্তিক্য ঈমানের আয়নায় দেখে নিতে পারেন। কিভাবে এবং কি বিশ্বাস নিয়ে কমিউনিস্ট হতে হয়, ডঃ আহমদ শরীফ তার এক দৃষ্টান্ত। কমিউনিস্ট মানেই নাস্তিক্য বিশ্বাসে বিশ্বাসী। একজন কমিউনিস্ট যদি বলে আমি স্রষ্টায় বিশ্বাস করি না, শাস্ত্রে বিশ্বাস করি না, ধর্মে ও আখেরাতেও আমার বিশ্বাস নেই, তাহলে আমি

www.nagorikpathagar.org

বলবো, সে সঠিক কথা বলেছে। এ ক্ষেত্রে তার ঈমানে কোন ভেজাল নেই, মন ও মুখ তার এক। যে আল্লাহতে বিশ্বাস করে না, তার ধর্ম, শাস্ত্র ও পরকাল মানার প্রশ্নই উঠে না।

ডঃ আহমদ শরীফ মুনাফিক কমিউনিস্ট নন। তিনি সমাজতন্ত্রে ইসলাম যোগ করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য কখনো এ কথা বলেননি যে, সমাজতন্ত্রে যারা বিশ্বাস করেন না, তারা ইসলামে বিশ্বাসী নন অথবা বলেননি যে, 'ধর্ম-কর্ম আর সমাজতন্ত্র হোক জীবনের মূল মন্ত্র।' তিনি বক্তৃতায় দাঁড়িয়ে এ কথা কখনো বলেননি যে, 'আমি আল্লাহতায়ালাকে হাজির-নাজির জেনে বলছি', অথবা এ কথা কখনো বলেননি যে, 'সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামের বিরোধ নেই', 'সমাজতন্ত্র কখনো মানুষের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করে না।' ডঃ আহমদ শরীফ বরং সাফ সাফ জবানে বলেছেন, 'আমি সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। তাই প্রথম লেখা থেকে আজ পর্যন্ত আমি মানুষের পুরনো বিশ্বাস, সংস্কার, নিয়ম, শাস্ত্র ও প্রচলিত আইন সব কিছুকেই আঘাত করেছি, বিশ্বাসের দুর্গে আঘাত করে চলছি।' চমৎকার! খাঁটি সমাজতন্ত্রীর কথাই বটে। এটা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস করতেই হয়, সমাজতন্ত্রীরা তা করেও থাকেন, কিন্তু অনেকে মুনাফিকীর মুখোশ পরে করে থাকেন বলে ঘোষণা করতে ভয় পান। ডঃ আহমদ শরীফ সে ভয় করেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালে হাজার হাজার ছাত্রকে এই ইলিম-তালিম দিয়েছেন।

বিয়ের আগে যৌন মিলন আর চলচ্চিত্রে চুম্বনের ব্যাপারটি আমার মতে এখানে অত্যন্ত গৌণ। কারণ, কোনো নীতি যিনি মানেন না, জবাবদিহির কোনো চিন্তা-চেতনাও যার নেই, 'বিক্ষুব্ধ সংমিশ্রণ' যার জীবন-দর্শন, তাঁর পক্ষে এ ধরনের মন্তব্য করা আর এমন রেওয়াজ-রীতির ওকালতি করা অত্যন্ত সহজ ও সম্ভব। সুতরাং এসব তাঁর বিশ্বাস ও চরিত্রের ব্যাপার-স্যাপার। এ নিয়ে উচিত-অনুচিতের আলোচনা করা এখানে অবান্তর বলে মনে করি।

ডঃ আহমদ শরীফের মন আর মুখের এই ঐক্য আর তাঁর সাহসী প্রকাশ থেকে সকল ধরনের খলল ঈমানের নির্জীব বুদ্ধিজীবীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। সমাজতন্ত্রীরা তাকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করে মুখোশমুক্ত অবস্থায় প্রকাশিত হয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে বাঁচাতে পারেন। কিভাবে কমিউনিস্ট হতে হয়, কিভাবে মন আর মুখ এক করে কথা বলতে হয়, সে শিক্ষা তারা ডঃ আহমদ শরীফ থেকে গ্রহণ করতে পারেন। অবশ্য মুখোশ পরে

www.nagorikpathagar.org

ধোঁকাবাজি করে আপন হওয়ার খল চিন্তা নিয়ে যারা সমাজতন্ত্রী হয়েছেন, তাদের কথা ভিন্ন।

ডঃ শরীফের বিপরীত চিন্তাধারাকে যারা সঠিক মনে করেন, তাদেরও উচিত নিজ চিন্তা ও বিশ্বাস প্রকাশের ব্যাপারে কমপক্ষে এ ধরনের দৃঢ়তা থাকা। নিজ নিজ চিন্তা-বিশ্বাসকে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রকাশ করতে যারা ভয় পান আর মুনাফেকী নেকাব পরে সব দিকে তাল রাখেন, তারা প্রকৃতপক্ষেই কাপুরুষ। মনের দিক থেকেও ক্লীব অর্থাৎ না ঘরকা, না ঘাটকা। ডঃ আহমদ শরীফের চিন্তাধারায় যারা বিশ্বাসী, তারা মেহেরবানি করে একে একে ঘোষণা দিয়ে যদি মুসলমানের প্লাটফরমটা খালি করেন, তাহলে আদমশুমারী কর্মীদের জাত-বিচারে কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না, আর আস্তিক-নাস্তিক চিনতেও সাধারণ মানুষের ভুল হবে না এবং মৃত্যুর পর জানাযার প্রশ্নও কেউ তুলবে না

তিনি মানুষ থাকতে পারলেন না

[রচনাকাল : ৮ই মে, ১৯৯২ সাল]

ধর্মের উপর ডঃ আহমদ শরীফের সাম্প্রতিক একটি মন্তব্য নিয়েই আমার এ আলোচনা। তাঁর মন্তব্যটি হচ্ছে এই : 'ধর্মের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে যে মানুষ হয়, সে মানুষ থাকে না। তার মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না। মানুষ হতে হলে বুদ্ধিজীবী হতে হবে'-ইত্তেফাক ২৪/৪/৯২। তিনি এই মন্তব্য করেন ২৩শে এপ্রিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতায়।

ধর্মের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে যে মানুষ হয়, সে প্রকৃতপক্ষে মানুষ না অমানুষ হয় এবং তিনি ধর্ম না মেনে মানুষ না অমানুষ হয়েছেন, সে আলোচনা করা দরকার। তবে এ আলোচনায় যাবার আগে এই স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবী সমীপে আমি সবিনয়ে কয়েকটি প্রশ্ন রাখছি।

প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে এই, আপনি সাম্প্রদায়িক কোন দলকে পছন্দ করে না, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আপনার কণ্ঠ সদা সোচ্চার আর আপনার কলম শাণিত এক তলোয়ার। হিন্দু-বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান-এই তিন সম্প্রদায়ের তিনটি নামকে কি আপনি সাম্প্রদায়িক নাম মনে করেন? যেমন 'ইসলাম' শব্দটি শুনলে আপনি মনে করেন একটি সাম্প্রদায়িক শব্দ? যদি তা মনে করে থাকেন, তাহলে আপনি কেন এই সাম্প্রদায়িক ধর্মসভায় গেলেন? আপনি তো ধর্মই মানেন না, সেটা যে ধর্মই

www.nagorikpathagar.org

হোক। কারণ, আপনার বক্তব্য হচ্ছে এই, ধর্মের সংস্পর্শে থাকলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, মনুষ্যত্ব থাকে না। আপনার মত একজন পাক্কা নাস্তিক এবং ধর্মবিরোধী 'বুদ্ধিজীবী' সেই ধর্ম সভার সংস্পর্শে গেলেন এবং বক্তৃতাও করতে পারলেন, এটা কিভাবে সম্ভব হলো তা বুঝলাম না। আপনি এই ধর্মসভায় যোগদান করে এবং 'ওয়াজ' করে কি 'মানুষ' থাকতে পারছেন? মনুষ্যত্ব রক্ষা করতে কি সক্ষম হয়েছেন? ধর্মের বিরুদ্ধে আপনার এত কড়া মন্তব্য শোনার পরও এই তিন ধর্মের উপস্থিত প্রতিনিধিরা আপনার ওপর নাখোশ হওয়ার ভাব প্রকাশ না করার কারণ কি? আপনি হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মকে কি ধর্ম মনে করেন না? ধর্ম বলতে কি শুধু ইসলামকেই বুঝেন? হ্যাঁ, আমি জানি, আপনি ইসলামকে এখন দু'চোখে দেখতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে সহ-অবস্থান নীতি কি মেনে চলেন? আপনি ধর্মত্যাগী 'মানুষ' হয়ে, 'মনুষ্যত্ব' অর্জন করে এবং অধর্মের 'বুদ্ধিজীবী' হয়ে কট্টর সাম্প্রদায়িক সম্মেলনে কিভাবে গেলেন? সে ধর্ম সভায় যোগদান করে 'মানুষ' থাকতে পারেননি, 'মনুষ্যত্ব'ও হারিয়েছেন, এই সাথে আপনার সাত রাজার ধন তুল্য 'বুদ্ধিজীবী' দাবিটাও হারালেন। এই সমাবেশে গিয়ে যখন দেখলেন মঞ্চের পিছনের পর্দায় মন্দির, প্যাগোডা, গীর্জা, আর মসজিদের ছবি, তখন অধর্মের গহব্বর থেকে আহরিত আপনার 'মনুষ্যত্ব' কি একটুও রি-অ্যাক্টও করলো না? সভাস্থলে ১ম ও ২য় সারিতে টিকি ও তিলকধারী উদামদেহী ঠাকুর, জটাধারী সন্ন্যাসী, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও গোঁফধারী সাধু, পাগড়ী ও জপমালা পরিধানকারী বাউল, গেরুয়া পোশাকের ভিক্ষু ও শেষ সারির গোলটুপি লম্বা কোর্তা পরিহিত মৌলভী উপবিষ্ট দেখে আপনার বিরোধী ধর্মনীতিবোধ কি একবারও আপনাকে ধাক্কা মারেনি? আমার তো মনে হয়, আপনার 'মানুষ' পরিচিতি সে দিন শেষ হয়ে গেছে। সে দিন আপনি মঞ্চের ওপর সাজানো চারটি ধর্মের কোন্‌টি গ্রহণ করে মানুষ থেকে অমানুষ হলেন, অধমকে অবহিত করলে অত্যন্ত কৃতার্থ হই।

বাদ আরজ এই, ধর্মের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে এ জগতে কে কে অমানুষ থেকে মানুষ হয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন সেই সব মনীষীর কথা আপনাকে শুনিয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ, আপনি তাদের মানুষই বলেন না। আপনি তো চরিত্রহীন কার্লমার্কস ও এঙ্গেলস, নিষ্ঠুর ডিক্টেটর লেনিন আর কোটি কোটি মানুষ হত্যাকারী স্টালিন ছাড়া কাউকে মানুষ বলে গণ্যই করেন না। তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন যার গর্ভে এবং ঔরসে, যারা

www.nagorikpathagar.org

আপনার মা-বাবা এবং আরো একজন আছেন, যার যত্নে, লালনে আপনি বড় হয়েছেন, লেখাপড়া শিখেছেন, যার ঠেলা ধাক্কায় ম্যাট্রিক পাস করে বাকি লেখাপড়া করেছেন এবং যার সুপারিশে উপযুক্ততা ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেয়েছেন, এই তিনজন যথা আপনার মা, বাবা ও চাচাকে (আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ) কি আপনি মানুষ বলেন? তারা তিনজনই ছিলেন পাক্কা ধার্মিক, নামাজী, রোজাদার এবং গভীর ধর্মানুরাগী। পিতা আব্দুল আজিজ শত ব্যস্ততায়ও নামাজ কাযা করতেন না। শুনেছি, আপনি নাকি কোনো দিনই আপনার মা-বাবাকে মা-বাবা বা আম্মা-আব্বা কোনটাই বলতেন না। সেটা কি তাদের ধর্মানুরাগের কারণে? 'মানুষ' হিসেবে স্বীকার করলেই তো প্রশ্ন আসে সম্বোধন আর সম্পর্কের। এমনও শোনা গেছে যে, আপনি ধর্ম ত্যাগ করে 'মানুষ' হয়ে যাওয়ার কারণে মরহুম সাহিত্য বিশারদ নিজের মেয়েকে আপনার কাছে বিয়ে দেননি, যদিও তিনি আপনাকে চাকরি দিয়েছিলেন এবং আপনার ডক্টরেট পাওয়ার পিছনেও তাঁর অবদান ছিল যথেষ্ট।

আমি তো একজন ধর্মহীন অধর্মের মানুষকে জানি, যিনি তার মা-বাবাকে কখনো কোনো দিন মা-বাবা বা আম্মা-আব্বা বলেননি। এ জন্য তার সন্তানেরা তাঁকে বাবা বা আব্বা বলেনি বরং তাকে আজব এক শব্দ দিয়ে সম্বোধন করে থাকে আর সেই শব্দটি হলো 'চুকুন বাছা।' বড় ভাইয়ের সঙ্গে ছিল তাঁর সাপে-নেউলে সম্পর্ক। মামলা-মোকদ্দমা চলে দীর্ঘ দিন। একে অন্যের মধ্যে কোনো দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না বড় ভাইয়ের মৃত্যু পর্যন্ত। অন্য এক ভাইয়ের সঙ্গে ছিল তিক্ত সম্পর্ক। আপনি কি সেই ব্যক্তি?

মানুষকে রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার না করার শিক্ষা দেয় ধর্ম। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ভাব রাখার তাগিদ দেয় ধর্ম, মা-বাবাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্বোধন করতে শিক্ষা দেয় ধর্ম। শুধু তাই নয়, যৌন জীবকে নৈতিক জীবে পরিণত করে ধর্ম, জীবনে শৃঙ্খলা আনে ধর্ম। ধর্মই প্রত্যেককে জীবন চলার পথে পাহারা দিয়ে জীবনের মূল লক্ষ্যে পৌঁছায়। এসব কথা আপনি বুঝবেন না। কারণ, অধর্মের বা ধর্মহীনতার রসায়ন-রস দিয়ে আপনার মগজ ধোলাই করে রাখা হয়েছে। ধর্মের ওয়াজও আমি আপনার কাছে করতে চাই না। কারণ, আপনি মুক্ত মন নিয়ে কোন ভাল কথা শোনার মত ফর্মেও নেই। একটি কথাই শুধু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যে ধার্মিক ব্যক্তিটির সুপারিশে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেলেন, সেই সুপারিশে তো ধার্মিকের আশ্রয়-প্রশ্রয় ও

www.nagorikpathagar.org

দোয়া আছে। এই সুপারিশের সুফল ভোগ করার কারণে কি আপনার 'মানুষ' পদবাচ্য আর 'মনুষ্যত্ব' খোয়া যায়নি? হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক পরিষদ। সেই পরিষদের সম্মেলনে যোগদান দিয়ে আর বক্তৃতা করে কি নিজ সংজ্ঞা অনুযায়ী আপনি 'মানুষ' থাকতে পারলেন?

খাসলতের খুঁজলি-পাঁচড়া

[রচনাকাল : ২৮শে অক্টোবর ১৯৯২]

ডঃ আহমদ শরীফের খাসলতের খুজলি-পাঁচড়া রোগ আর কলবের ব্যাধি মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ডঃ শরীফের মত আরও অনেকেই আছেন, তারাও একই ব্যাধিতে আক্রান্ত। কিন্তু তাদের ব্যাধির প্রকাশ কিছুটা মুনাফিকির আবরণে আবৃত থাকে। আর ডঃ আহমদ শরীফের ব্যাধির প্রকাশ বিলকুল উদাম। কোন রকমের মুনাফিকী নেই। যা বলেন, সাফ সাফ বলেন। তাঁর বলাবলিতে কোন রাখি-ঢাকি ব্যাপার নেই। যখন তিনি নেংটা হন, তখন পুরোপুরিই নেংটা হতে পারেন। জাঙ্গিয়াটাও খুলে ফেলেন। আমি ডঃ আহমদ শরীফকে বরাবরই মোবারকবাদ জানাই সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান দিগম্বর চরিত্রের জন্য। মুনাফিকী নেই তার কথা ও কাজে। এ জন্য তার পচন চরিত্রের উৎকট দুর্গন্ধ যে নির্ভেজাল দুর্গন্ধ, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

বলছিলাম, মাঝে মাঝে তাঁর দেহ ও মনের ব্যাধি প্রচণ্ডভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। গত ২১শে অক্টোবর বুধবার (১৯৯২) জাতীয় জাদুঘর শিশু মিলনায়তনে 'স্বদেশ চিন্তা সংঘ' আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির ভাষণ দেয়ার সময় ডঃ শরীফ পুরানো ব্যাধিতে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হন এবং এক পর্যায়ে রীতিমত দিগম্বর হয়ে প্রলাপগুলো বকতে থাকেন। তার প্রলাপগুলো একে একে বিন্যাস করে পেশ করছি।

* মুর্খতা ও মুসলমানিত্ব অভিন্নার্থক। যে লোক জ্ঞানী সে নাস্তিক।

* পৃথিবীতে এমন কোন অপকর্ম নেই যা আস্তিকেরা করেনি।

* যে কোন আস্তিকের চেয়ে একজন নাস্তিক সব সময়ই ভাল।

* প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ইসলাম টিকে আছে ইতর ও অজ্ঞানদের মধ্যে।

www.nagorikpathagar.org

*(তিনি প্রশ্ন রেখেছেন) ক'জন শিক্ষিত লোক ধর্মে বিশ্বাস করে?

* প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে ধর্মের অস্তিত্বহীনতা। (হাছা কথা, কথার মত একখানা কথাই বটে)।

* দেশে এখন তিন ভাষায় পড়ালেখা হচ্ছে। ধর্মান্ধরা পড়ছে আরবীতে, বড় লোক বদমায়েশদের ছেলেমেয়ে পড়ছে ইংরেজিতে, আর মধ্যবিত্ত ও গরিবরা পড়ছে বাংলায়।

* পুরুষদের যদি 'সততা' দরকার না হয়, নারীদের সতীত্বের দরকার কেন? নারীদের এ প্রশ্ন করার সাহস থাকতে হবে।

* দেশে এখন প্রতি দু'জন লোকের একজন চোর।

ডঃ আহমদ শরীফের এই সব প্রলাপ-প্রবচন বা তাঁর পচন-চরিত্র থেকে নির্গত দুর্গন্ধময় বাক্য নিয়ে দফাওয়ারী আলোচনা করার ইচ্ছা আমার নেই। তাঁর বিরুদ্ধে আমার অভিযোগও নেই। আইনের পুস্তকে নাকি আছে, পাগলের প্রলাপ বা পাগলের পাগলামি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোন মামলা চলে না। আইন যদি তাই হয়, তাহলে আমি এই আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ডঃ শরীফের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে চাই না। পাগলের বিরুদ্ধে মামলা না চলার বোধহয় কারণ এ হতে পারে যে, মাথাটা খারাপ থাকার কারণে পাগলরা নৈতিক বিধি ও বাক্যের অর্থ এবং ভাব প্রকাশে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না। তাই তাদের পাগলামিকে মামলার ঝামেলায় আনা হয় না। কিন্তু তাই বলে বদ্ধ পাগলকে একেবারে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়াও হয় না, সুস্থ নাগরিকের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় যাতে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়, সে জন্য প্রশাসনের লোক এমন পাগলকে পাকড়াও করে পাগলা গারদে বা মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ করে থাকে।

ডঃ আহমদ শরীফের মত কোন বুদ্ধিজীবী পাগলকে এ পর্যন্ত আমাদের সরকার মন আর মগজ ধোলাই করার লক্ষ্যে মানসিক হাসপাতালে বা পাগলখানায় প্রেরণ করেননি। এ জন্য এরা এত বেশি পাগলামি করতে পারছেন। সাধারণ পাগলের চেয়ে এই পাগলরা অধিকতর খতরনাক ও ক্ষতিকারক। সাধারণ পাগল উত্তেজিত হলে সামনে যা পায়, তা আঘাত করে। কিন্তু এই পাগলরা তাদের পাগলামি বুদ্ধি ও বিকৃত চিন্তাকে পাণ্ডিত্যের মুখোশ পরিয়ে সমাজে এমনভাবে পেশ করে, যা দেখে ইবলিস শয়তানও ধূর্তামির

www.nagorikpathagar.org

প্রতিযোগিতায় হার মেনে নিয়ে এই মানব-শয়তানদের বাহবা দেয়। এই মানব-শয়তানরা সমাজের মানুষকে ঈমান ও আখলাকের দিক থেকে সেভাবেই নেংটা করতে চায়, যেভাবে তারা নেংটা হয়েছে।

রসূল (সাঃ)-এর একটি নাম আহমাদ। এই আহমাদ নাম ধারণ করে যে বলতে পারে 'আমি নাস্তিক', তাঁর উচিত ছিল এসব কথা বলার আগে এফিডেবিটের মাধ্যমে নাম পরিবর্তন করে নাস্তিক নাম নেয়া। এদিক দিয়ে বলা যায়, আহমদ শরীফ পাক্কা ধোঁকাবাজ অথবা কাপুরুষ। সাহস হয়নি নাম পরিবর্তনের। এই মুনাফিকীর অভিযোগ ছাড়া ডঃ নাস্তিকের বিরুদ্ধে তাঁর দিগম্বরী চরিত্র সম্পর্কে অন্য কোন অভিযোগ আমার নেই। কথায় বলে, 'ছাগলে কিনা খায় আর পাগলে কিনা বলে।' আমাদের সমাজে বুদ্ধি-বিগুণজীবী পাঠা, খাসি আর বকরি এবং পাগল-পাগলিনীর উৎপাত-উপদ্রুব খুব বেশি শুরু হয়েছে। এদের রাখাল বা মালিকদেরও পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের এই উৎপাত-উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জনগণই এদের গলায় রশি আর পায়ে জিঞ্জির লাগিয়ে খোঁয়াড়ে আটকাবার যদি অভিযান শুরু করেন, তাহলে ঐ ছাগল-পাগলদের রাখাল ও মালিকরা যেন কোন হৈ চৈ না করেন। সে অবস্থা শুরুর আগেই রাখাল আর মালিকরা তাদের সামলান, এ আমার বিনীত আরজ।

কথা দিয়েছিলাম, ডঃ নাস্তিকের প্রলাপের দফাওয়ারী কোন আলোচনা করবো না। কিন্তু তবুও দু'চার কথা না বললে যেন কেমন কেমন লাগে।

ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানহীন মুর্খেরা মুসলমানিত্বকে মূর্খতার সমার্থক ভাবা অত্যন্ত স্বাভাবিক। অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর। ইসলাম সম্পর্কে যার অল্প বিদ্যাও নেই, সে তো ইসলাম আর মুসলমানিত্বকে শুধু ভয়ঙ্করই ভাবে না, এরও অধিক কিছু ভাবে। ইবলিস নিজেকে অত্যন্ত জ্ঞানী মনে করেছিল। এ জন্য আল্লাহর সিদ্ধান্তকে অমান্য করে। পরিণতি কি দাঁড়িয়েছিল তা ইবলিসের শিষ্য ডঃ নাস্তিক হয়তো জানেন না। পৃথিবীর মোট আয়তনের ৬ ভাগের ১ ভাগ শাসন করতো ডঃ নাস্তিকের মত 'সৎ' আর ইবলিসের মত 'জ্ঞানীরা'। তাদের স্বর্গরাজ্যকে তারা অক্ষত কেন রাখতে পারলো না? এমনকি ৭২ বছর পর্যন্ত 'জ্ঞানী নাস্তিকেরা' এমন 'সুখের দেশ'কে টিকিয়ে রাখতে পারলো না। জ্ঞানী নাস্তিকদের জনকদের গলায় ক্রেনের হুক লাগিয়ে 'মারো ঠেলা হেঁইয়ো' করে ভূতলে ফেলে দিল কেন? ইসলাম তো ১৪ শতাধিক বছর থেকে আছে। ক্রমশঃ তার বিস্তৃতি ঘটছে এবং 'মূর্খদের' দেশের সংখ্যা ষাটের ধারে কাছে। ডঃ নাস্তিক সাহেব বলুন তো, ৭২

www.nagorikpathagar.org

বছরে যা শেষ হয়ে গেল আর ১৪ শত বছর ধরে যার শুধু বৃদ্ধিই ঘটছে, বলুন কোন্‌টা মূর্খতার ফল, নাস্তিকের দুনিয়া, না ইসলামের দুনিয়া?

আপনি বলছেন, পৃথিবীতে এমন কোন অপকর্ম নেই যা আস্তিকেরা করেনি। আস্তিক হলেই কোন অপকর্ম করে না সে কথা আমিও বলি না। আস্তিক হয়েও অনেকে অপকর্ম করে। কিন্তু নাস্তিকদের বাদ দিচ্ছেন কেন? নাস্তিকদের বাপ বা খালু-মামু বলে যারা কথিত ও পরিচিত, তাদের চরিত্র সম্পর্কে কি কোন খবর রাখেন? ভূত হয়ে তারা আপনার পিঠে সওয়ার হয়েছে বলে কি তাদের দেখেন না? কার্লমার্কস আর এঙ্গেলসের মত চরিত্রহীনদের আপনি গুরু মেনেছেন, কিন্তু আপনি কি জানেন, বাসার চাকরানীর সাথে অপকর্ম করে কিভাবে কার্লমার্কস নিজের স্ত্রীকে বিতাড়ন করেছিলেন? কি কারণে কার্লমার্কস বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে দিন কয়েক হাজতবাস করেছিলেন? এঙ্গেলসের চরিত্র যে কি জঘন্য ছিল, তাও কি আপনার অজানা? নিষ্ঠুর ডিক্টেটর লেনিন আর কোটি কোটি মানুষ নিধনকারী স্ট্যালিনের কর্মকাণ্ডকে কি আপনি অপকর্ম মনে করেন না?' এরা তো জ্ঞানী নাস্তিক, এ জন্য কি তাদের সব অপকর্মকে সৎ কর্ম মনে করেন?

আস্তিকের চেয়ে নাস্তিককে আপনি সব সময় ভাল মনে করেন। কারণ, আদর্শের ভাইকে খারাপ বলতে যাবেন কেন? আপনি তো সেই আদর্শের। ওদের খারাপ বললে আপনার মাসোহারা তো যাবেই, অস্তিত্বহীন হয়ে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবেন। আপনি প্রশ্ন রেখেছেন, ক'জন শিক্ষিত লোক ধর্মে বিশ্বাস করে? ডঃ নাস্তিক সাহেব, আপনাকে কি আর বলবো, ধর্মে বিশ্বাস করে থাকেন এমন উচ্চ শিক্ষিত লোক এই পৃথিবীতে শুধু লাখ লাখ নয়, কোটি কোটি আছেন। যাদের যে কোন একজনের কাছে আপনি বাকি জীবন যে কোন বিষয়ের ওপর শিক্ষা গ্রহণ করলেও তাদের জ্ঞানের এক কণাও আয়ত্ব করতে পারবেন না। কুঠুরীর পেঁচা স্বর্ণ ঈগলের (শাহীন) মর্ম ও কদর কি বুঝবে? আস্তিক বাবার ঔরসে জন্ম নিয়ে হয়েছেন নাস্তিক। আপনার মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধেরও বড্ড অভাব। যথাযথ যোগ্যতা ছাড়াও আপনি আস্তিক চাচার সুপারিশে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিটা পেয়েছিলেন বলে 'ইবলিস জ্ঞানী' সেজেছেন। আপনার আস্তিক চাচাকেও কি আপনি মূর্খ বলেন? হ্যাঁ, বলতে পারেন এবং তা বলতেও পারবেন। কারণ, যে শয়তান আপনার শিরায় শিরায় এমন কি রক্তের কণায় কণায় মিশে গেছে, সে এসব কথা ছাড়া আর কোন ভাল কথা কি শিক্ষা দিতে পারে?

www.nagorikpathagar.org

নারীদের সতীত্বের দরকার নেই বলে আপনার অভিমত। হ্যাঁ, এমন অভিমত ব্যক্ত না করলে আপনি হয়তো আপনার চরিত্রের দাগগুলো মুছতে পারবেন না। আপনি বলেছেন, এ দেশে প্রতি দু'জন লোকের একজন চোর। এই জরিপ আপনি কোন উপাত্ত ও উপাদানের ভিত্তিতে করলেন, তা জানি না। যদি আপনার এ জরিপ সঠিক হয়, তাহলে আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা, আপনার সন্তানরা এবং আপনি ও আপনার বেগম সাহেবা নিয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ জন। বলুন তো, কোন তিনজন চোর? দু'জনে একজন যদি চোর হয়, তাহলে আপনার পরিবারে ক'জন চোর হওয়া উচিত, আপনিই হিসাব কষে দেখুন এবং কে কে চোর, তা চিহ্নিত হয়ে যাওয়া উচিত।

আপনার প্রতি আমার অনুরোধ, ভাল একজন সাইকিয়াট্রিস্টের শরণাপন্ন হন। আপনার চিকিৎসার দরকার। ব্রেন বিড়ম্বনায় ভুগছেন। চরিত্র তো আপনার গেছে বহু আগেই। বুড়া বয়স। পাগল হয়ে মৃত্যুবরণ না করলেই আমি খুশি হবো। তবে চিকিৎসার দরকার আরও অনেকের, যারা আপনাকে বুদ্ধি-বিকৃতজীবী জেনেও বিভিন্ন মঞ্চে দাঁড় করায়।

ডক্টর নাস্তিক সাহেব, আপনি এত প্রলাপের মধ্যেও একটি সুস্থ, সুন্দর ও সত্য কথা বলেছেন। আর তা হচ্ছে এই- 'প্রকৃতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা হচ্ছে ধর্মের অস্তিত্বহীনতা।'

ডঃ শরীফের বিচ্ছিন্ন বিভ্রান্ত সংলাপ

'আমি নাস্তিক্য ধারাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। কূল-কিনারা না পেয়ে দুর্বলেরা আস্তিক্যবাদ গড়ে তোলে, পরবর্তীকালে সেগুলো ধর্ম-নির্ভর দর্শনে পরিণত হয়। আমি কোন প্রথাগত ধর্মে বিশ্বাস করি না। স্রষ্টা থাকতেও পারেন, কিন্তু শাস্ত্র থাকবে তার কোন মানে নেই। স্রষ্টা থাকলেই তাঁর উপাসনার প্রয়োজন আছে, এটাও আমি বিশ্বাস করি না। বিবাহপূর্ব দৈহিক সম্পর্কে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি পরলোক বিশ্বাস করি না, তাই আমার মৃত্যু ভয় নেই। শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ সবটাই কুসংস্কার।'-ডঃ আহমদ শরীফের সাক্ষাৎকার, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৫/২/৮৫।

'ইসলাম একটি বিদেশী সংস্কৃতি। তোমরা ইসলাম ছাড়, আমরা বিদেশ ছাড়াবো। আমাদের মুসলমান বানিয়ে বেহেশতে পাঠাবার অধিকার তাদের কে

www.nagorikpathagar.org

দিয়েছে? আমাদের এখন নাস্তিকতা অনুশীলন করতে হবে।' -ডঃ আহমদ শরীফ, ৩/২/৮৯ দৈনিক মিল্লাত।

'১৯৭৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে বিসমিল্লাহ্ যোগ করায় বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান অপবিত্র হয়ে গেছে এবং আমরা মনুষ্যত্ব হারিয়েছি।' -ডঃ আহমদ শরীফ। বাংলা একাডেমীর আলোচনা সভায় সভাপতি হিসাবে ভাষণ ২১/২/৯২।

'ইহুদী-খ্রিস্টান-মুসলিম বিশ্বাস করে লোহিত সাগর মুসার দলের পলায়নের জন্য শুকিয়ে যায়। ...যদিও আজকাল নিরক্ষর লোকও জানে, গোটা পৃথিবীময় নদী-সাগর, উপসাগর ও মহাসাগর অবিচ্ছিন্নভাবে জলময়, তা আংশিকভাবে শুকনা কিংবা শোষণ করা অসম্ভব। কাজেই এটা অজ্ঞ মানুষের কল্পনাজাত বানানো গল্প, তেমনি আবাবিলের ঠোঁঠচ্যুত কাঁকড় কণার আঘাতে আব্রাহাম বাহিনীর বিনাশ। অজ্ঞ লীলাবাদী মানুষের বিশ্বাসযোগ্য অদ্ভুত বানানো গল্প মাত্র। একালে এসব অচল ও অবিশ্বাস্য হওয়ারই কথা। -ডঃ আহমদ শরীফ, কবি মতিউর রহমান খান পঞ্চম স্মারক বক্তৃতা ২রা ও ৩রা মার্চ ১৯৯২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

'মূর্খতা ও মুসলমানিত্ব অভিন্নার্থক। যে জ্ঞানী সে নাস্তিক। পৃথিবীতে এমন কোন অপকর্ম নেই যা আস্তিকেরা করেনি। যে কোন আস্তিকের চেয়ে একজন নাস্তিক সব সময়ই ভাল। প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ইসলাম টিকে আছে ইতর ও অজ্ঞানদের মধ্যে।' (-ডঃ আহমদ শরীফ, জাতীয় জাদুঘর শিশু মিলনায়তনে প্রদত্ত ভাষণ, ২১/১০/৯২ বুধবার। ২৫/১০/৯২ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়)।

'আসলে আমরা জাতি হিসাবেই বন্ধ্যা। আমরা পুরানোকেই আঁকড়ে ধরে আছি। যুক্তি মানি না, নতুনকেও জানতে চেষ্টা করি না। অথচ কোন পুরানোতেই কোন জৌলুস নেই, কোন উপভোগ নেই।' -ডঃ আহমদ শরীফ, ৫/১২/৯৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টি,এস,সি সেমিনার কক্ষে স্বদেশ চিন্তা সংঘ আয়োজিত প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।

'নাস্তিক না হলে নারীরা স্বাধীনতা পাবে না। নারীদের নাস্তিক হওয়া উচিত। পৃথিবী কোন শাস্ত্রে নারী স্বাধীনতা নেই। বিজ্ঞানের যুগে কেউ স্বধর্ম মেনে চলতে পারছে না। গায়ের জোরে আমরা আস্তিক। অশিক্ষিত লোকের সন্তানরা মাদ্রাসায় পড়ে। লেখাপড়া জানা কিন্তু মনের দি থেকে অশিক্ষিত কিছু লোক

www.nagorikpathagar.org

সারা দিন তসবীহ জপে এবং কপালে দাগ ফেলে। -ডঃ আহমদ শরীফ, ২৭/৪/৯৪, দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয় ২৮/৪/৯৪ তারিখে। ডঃ বি আর আম্বেদ করের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নবর্ণের হিন্দু ছাত্রদের সংগঠন 'বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়ার্ড ক্লাস অর্গানাইজেশন' আয়োজিত আলোচনা সভায় ডঃ আহমদ শরীফের প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।

'মর্ত্য জীবনই হল বাস্তব। এর মধ্যে কোন প্রকার ধর্মীয় বিশ্বাস এবং কোন অনুমানের অবকাশ নেই। ইসলামের বিভিন্ন ইমাম বিভিন্ন মত ও পথ সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং ধর্ম বলতে এমন কোন কিছু নেই।' ২০শে জুলাই ১৯৯৪ বুধবার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে কর্নেল তাহের সংসদের উদ্যোগে 'রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার গণতন্ত্রের সংকট' শীর্ষক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে ডঃ আহমদ শরীফ একথা বলেন ঃ দৈনিক সংগ্রাম ২১/৭/৯৪।

'স্রষ্টা থাকলেই শাস্ত্রও থাকবে কিংবা স্রষ্টাকে মানলেই শাস্ত্রকেও মানতে হবে, এমন বিশ্বাসে কিংবা দাবিতে চিন্তার বা যৌক্তিক চেতনার সমর্থন মেলে না। কেননা আমরা দেখেছি আদিম ও আদি মানবেরা যেসব দেবতা মানত, শাস্ত্রীয় যেসব আচার-আচরণ, পুজা-উপসনা ও পার্বণিক অনুষ্ঠান করত, সেগুলো পরবর্তীকালে তাদেরই বংশধরদের কাছে মিথ্যা, ভুল ও হাস্যকর-বিশ্বাস ও আচার বলে অবজ্ঞেয় ও পরিচার্য হয়েছে, তেমন পরিহার-প্রক্রিয়া আজো চলছে নানাভাবে বিভিন্ন সমাজে।'(কালের দর্পনে স্বদেশ ঃ ১০৬)

'ধর্মীয় মতবিরোধ ও অসহিষ্ণুতায় এবং স্বশাস্ত্রীয় মতগত কোন্দলে আজ অবধি পৃথিবীতে যত রক্তপাত হয়েছে, মানুষে মানুষে যত দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ টিকিয়ে রেখেছে, যত প্রাণহানী ঘটেছে, এমনটি কোন খরা-ঝড়-বন্যায়-ভূকম্পনে-মহামারীতে কিংবা সামাজিক যুদ্ধেও সম্ভব হয়নি।' (কালের দর্পনে স্বদেশ ঃ ১০৬)

'জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বুদ্ধি প্রয়োগে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, সচ্চিদানন্দ স্রষ্টা চির অজয়, অমর হলেও শাস্ত্র চিরন্তন হতে পারে না। স্বয়ং স্রষ্টাই স্থানে স্থানে, কালে কালে নব নব নবী-অবতার মাধ্যমে তাঁর বাণী ও বিধান বদলেছেন, দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী করে জারি করেছেন নতুন বিধি নিষেধ। এ সত্যের, তথ্যের ও উপলব্ধির আলোকে আজ যদি মানুষ কেবল স্রষ্টার অনুগত তথা উপাসক হয়, কালিক ও স্থানিক প্রয়োজনে তৈরি শাস্ত্রকে অবহেলা করে অথবা

www.nagorikpathagar.org

স্বদেশের স্বকালের স্বসমাজের মানুষের জীবন-জীবিকার ও পরিবর্তমান জীবন যাত্রা পদ্ধতির অনুগত করার লক্ষ্যে গ্রহণে-বর্জনে শাস্ত্রের সংস্কার করে (প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সংবিধান যেমন সংশোধন করা হয়) তাহলে আজকের পৃথিবীর রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মানবিক সমস্যার অনেকগুলোর সমাধান সহজে মিলবে।' (কালের দর্পণে স্বদেশ : ১০৬)

'অথচ আমরা জানি, প্রলোভন প্রবল হলে স্রষ্টার উপস্থিতি সর্বত্র এবং তিনি অন্তর্যামী জেনেও মানুষ লোকনিন্দার ও শাস্তির ভয় এড়িয়ে গোপনে সব পাপ কর্মই করে। তখন স্রষ্টা ও শাস্ত্র তাকে সংযত ও বিরত রাখতে পারে না। কাজেই মানুষের শাস্ত্রানুগত্য আসলে পাপ-ভীতিপ্রসূত নয়, লোকাচারের অনুগত থাকার সামাজিক ভড়ং মাত্র'। (কালের দর্পনে স্বদেশ : ১০৭)

'সবাই জানি, কামে-প্রেমে, মানুষ কখনো দেশ-জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্মের বাধা মানেনি, অর্থ-সম্পদ অর্জনেও ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখা মনে রাখেনি। অভাবে অকালে যেমন খাদ্যাখাদ্যের বিচার করেনি, এ যুগে দেশে-বিদেশে, শহরে-বন্দরে, অশনে-বসনে, নিবাসে-নিদানে, আচারে-আচরণে, ভাব-চিন্তা-কর্মে কোথাও কারুর শাস্ত্র নির্দেশিত স্বাতন্ত্র্য ও নিয়ম-নীতি মানা সম্ভব হচ্ছে না। তবু মানুষ নাস্তিক হয়নি। পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছে বলেও গ্লানিবোধ করে না।

আজকের দিনে কালিক ও স্থানিক জীবন-জীবিকার প্রতিবেশ-বিরোধী শাস্ত্রীয় নিয়ম-নীতি পরিহার করা জীবন পথের ও জীবন যাত্রার বিঘ্ন অপসারণের নামান্তর মাত্র। এ উপলব্ধি যে মানব মুক্তি ঘটাবে, তা সামগ্রিক ও সামষ্টিকভাবে মানুষের মনুষ্যত্বের এবং মানবিক মূল্যবোধের দ্রুত বিকাশ ঘটাবে, যা গোড়ায় ধর্ম শাস্ত্রেরও ছিল মূল লক্ষ্য।' (কালের দর্পনে স্বদেশ : ১০৭-১০৮)

শাস্ত্রের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য পরিহার ও মুক্ত বুদ্ধি প্রয়োজন। (কালের দর্পনে স্বদেশ : ১০৮)

'নাস্তিক হওয়া সহজ নয়। এ এক অনন্য শক্তির অভিব্যক্তি। কেননা বিশেষ জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও মনোবল না থাকলে নাস্তিক হওয়া যায় না।

'কেবল মুখে আস্তিক্য প্রমাণ করে অর্থাৎ পুরনো রীতিনীতি নীরবে মেনে নিয়ে যে কোন চরিত্রহীন দুরাচারী সহজে সাদরে ঠাঁই পায়। যদিও এরাই সামাজিক জীবনে যন্ত্রণা সৃষ্টির জন্য দায়ী।' -ডঃ আহমদ শরীফের 'যুগ যন্ত্রণা' প্রবন্ধ বইয়ের ১ম পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত। ১৯৭৪ সালে ঢাকার চৌধুরী পাবলিশিং হাউস থেকে পুস্তকটি প্রকাশিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

বিগত হাজার বছরের মধ্যে দেশী মুসলমানের জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তেমন কোন কৃতিত্ব ও কীর্তির সম্মান মেলে না-প্রাগুক্ত-২৫ পৃষ্ঠা।

'ধর্ম, বর্ণ, জাত ও ভাষার ভিত্তিতে মানুষকে বিঘ্নিত করার ইতরতা পরিহার না করলে মানুষের এই দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি নেই। তাই তো সমাজে, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে, শিল্পে কিংবা রাজনীতি বা অর্থনীতিতে ধর্মের দৌরাত্ম্য।' যুগযন্ত্রণা-পৃষ্ঠা-২৯।

'কুরআন মুখ্যত ও বাহ্যত আরবদের জন্য এবং গৌণত ও স্বরূপগত বিশ্ব মানবের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ। কুরআনের বক্তব্য, বিষয় কয়েকটি মাত্র, কিন্তু সব কথাই পুনরাবৃত্ত হয়ে স্ফীত কলেবর হয়েছে'-যুগযন্ত্রণা-পৃষ্ঠা ২৯।

'অজ্ঞ, অসহায়, অক্ষমের বিশ্বাসের বিস্ময়ে, কল্পনায় যে ধর্মবোধের জন্ম, আবেগে, অনুভবে ও ভীরুতায় যার লালন, সংস্কারে ও সভায় স্বীকৃতিতে যার স্থিতি এবং ত্রাস শংকায় যার চিরায়ু, সেই শাস্ত্রীয় ধর্মের প্রাণ মূলে বৈনাশিকে আঘাত হেনে ধর্ম সম্পর্কে মানুষকে উদাসীন করেছেন মুখ্যত কার্লমার্কস্ই, বিজ্ঞান বা দর্শন নয়। কেন না বিজ্ঞান দর্শনের ছাত্ররা আজো আস্তিক। আজো দুনিয়াব্যাপী নাস্তিকের আত্মশক্তিই মানুষের জন্য সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান নতুন ভুল রচনা করেছে।' 'যুগ যন্ত্রণা'-৫৭ পৃষ্ঠা।

নাস্তিকদের জন্য অনুকরণীয় এক দৃষ্টান্ত

ডক্টর আহমদ শরীফের ইন্তেকাল হয়নি, তিনি ইন্তেকাল করেননি। ইন্তেকাল অর্থ শুধু মৃত্যু নয়, অস্থায়ী ঠিকানা থেকে স্থায়ী ঠিকানায় ট্রান্সফার হওয়া। অর্থাৎ যিনি ইন্তেকাল (মুসলমানদের ক্ষেত্রে) করেন, তাঁকে কবরে রেখে আসল ঠিকানার উদ্দেশ্যে শরীয়ত বিধি অনুসারে শেষ বিদায় দেয়া হয়। ডঃ আহমদ শরীফের ক্ষেত্রে এ কাজ করা হয়নি। এমন করতে তিনি জীবিতাবস্থায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাখেন। সুতরাং বলা যায়, তিনি ইন্তেকাল করেননি। তিনি যে 'মরহুম' এ কথাও বলা যাবে না। বলা যাবেনা এ কারণে যে, 'মরহুম'-এর অর্থ হলো এই, যিনি আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত। মৃত্যু আল্লাহর তরফ থেকে মোমিনের জন্য রহমতস্বরূপ। ডঃ আহমদ শরীফ ছিলেন পুরোপুরি নাস্তিক। নাস্তিক মানে আল্লাহতে যার বিশ্বাস নেই, দ্বীন মানেন না। মুসলমান নাম নিয়ে মুসলিম মা-বাবার গর্ভে ও ঔরসে জন্ম নিয়ে জীবনের একটা পর্যায়ের পর যে নাস্তিক

www.nagorikpathagar.org

হয়ে যায় এবং নাস্তিক হয়েই মৃত্যু বরণ করে, এমন নাস্তিকের মৃত্যু আল্লাহ 'রহমত' নয় বরং আল্লাহর তরফ থেকে এক গযব। এ মৃত্যু অভিশপ্ত মৃত্যু। ডঃ আহমদ শরীফ নাস্তিক হয়েই মৃত্যু বরণ করেছেন। অতএব তার ক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তিনি ইন্তেকালে নেই, মরহুমে নেই, তবুও তিনি প্রায় অক্ষত অবস্থায় (চোখ দুটি ছাড়া) ১৯৯৯ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ছিলেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের হিমঘরে। এ পিরিয়ডকে অনেকে বলতেন 'লাশ ছিল ট্রানজিট ক্যাম্পে।' বেচারার লাশ নিয়ে ওয়ারিশরা কম দৌড়াদৌড়ি করেননি। লাশ তারা প্রথমে দিতে চেয়েছিলেন সলিমুল্লা মেডিক্যাল কলেজে, কিন্তু সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ এ লাশ নিতে রাজি না হওয়ায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়, কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ লাশ গ্রহণে সরাসরি অস্বীকৃতি জানান। এ দু'টি কলেজে ব্যর্থ হওয়ার পর আরও দু'তিনটি কলেজে লাশ দেয়ার চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু সে সব কলেজ কর্তৃপক্ষ লাশ গ্রহণ করেননি। অতঃপর বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ করেন। মৃত্যুর পরই তার লাশ এই কলেজ ল্যাবরেটরিতে ডিসেকশনের জন্য চলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যে সব ছাত্র লাশ ব্যবচ্ছেদ করবে তারা বেঁকে বসে। তারা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়, এ লাশ স্পর্শ করবে না। ফলে পরবর্তী ব্যাচের অপেক্ষায় লাশ হিমঘরে পড়ে থাকে।

১৯৯৯ সালের ১লা জুলাই থেকে ডঃ আহমদ শরীফের মরদেহ ব্যবচ্ছেদের কাজ শুরু হয়। এ কাজ পর্যায়ক্রমে চলে কয়েক মাস। মস্তিস্কটি আগেই সংরক্ষিত করা হয়। ব্যবচ্ছেদের প্রথম পর্যায়ে ছাত্ররা তার মরদেহের চামড়া তুলে নেয়। তারপর ছুরি-চাকু চালাতে শুরু করে। এই কাটাকাটিও শেষ হয়ে গেছে বেশ আগে। তার হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, অন্ত্র, কিডনি, মূত্রথলিসহ বিভিন্ন ধরনের ভিসেরা কলেজের ল্যাবরেটরিতে রাখা হয়েছে। দেহের সব মাংস হাই পাওয়ার কেমিক্যাল দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। থেকে যায় শুধু হাড্ডি। এই হাড্ডি এখন সংরক্ষণে আছে, না কোন আস্তাকুড়ে, না মাটির নিচে আছে তা আর জানি না।

জীবিত থাকতে তিনি লিখিতভাবে অসিয়ত করে যান, মৃত্যুর পর তিনি না যাবেন গোরে, না যাবেন শ্মশানে আর না নেবেন ধর্মীয় বিধানে সৎকারের আনুষ্ঠানিকতা। এ কারণে তার লাশ না গেল গোরে আর না গেল শ্মশানে। নিজ দেহকে মৃত্যুর পর দান করার যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেন, সে দৃষ্টান্ত এ দেশে দ্বিতীয়। প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন বরিশালের আরজ আলী মাতবর নামক

www.nagorikpathagar.org

এক ব্যক্তি। তিনি আদালতে গিয়ে নিজের দেহকে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দানের উইল করে যান। ডঃ শরীফও একই কায়দায় আরজ আলী মাতবরের পথ অনুসরণ করেন। তিনি ১৯৯৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (জনাব এম আফজালুর রহমান) আদালতে একটি অসিয়তনামায় স্বাক্ষর করেন। সেই অসিয়তনামায় ডঃ শরীফ বলেন, আমার দেহ দানের বিষয়ে আমার স্ত্রী ও পুত্রগণের সম্মতি আছে। ডঃ শরীফের মৃত্যুর পর এই অসিয়তনামা তার বড় ছেলে ও কন্যা বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এ্যানাটমি বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডাঃ এম আর সরকারের কাছে হস্তান্তর করেন।

কেউ কেউ তো কৌতুক করে বলেন, তিনি কবরের আযাব থেকে বেঁচে গেলেন। ফেরেশতাদের নানা সওয়াল-জওয়াবের সম্মুখিন হলেন না। এই রসিকজনেরা এ কথা দ্বারা কি এই বুঝাতে চান যে, লাশ কবরে না রাখলেই কবরের আযাব হবে না? পানিতে ডুবে মরা মানুষের যে সব লাশ পানিতে পচে গলে মিশে যায় বা অন্যভাবে মরার পর লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তারা কি কবরের আযাব থেকে মাফ পেয়ে যান? শ্মশানে যাদের লাশ দাহ করা হয়, এদের ব্যাপারে এই রসিকজনদের রায় কি একই? যদি এ মন্তব্য রসিকতা না হয়, তাহলে বলবো, রূহের আযাব সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। এখন যে ধারণা তারা পোষণ করছেন, সে ধারণার আগাগোড়া গলদ। রূহের খাঁচাটাকে তারা আসল মানুষ ভেবে বসে আছেন। মানুষের ভিতর থেকে রূহ চলে গেলে লক্ষ্য করে দেখবেন, সেই মানুষের গোটা দেহ অবিকৃত ও অক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকে। তখন তার চোখ থাকে কিন্তু সে চোখ কিছুই দেখে না। হাত দু'খানা থাকে, কিন্তু হাত নাড়াতে পারে না। পা থাকে কিন্তু হাঁটতে পারে না। মুখ-জিহ্বা সবই থাকে কিন্তু কথা বলতে পারে না। রূহবিহীন লাশে আঘাত করলে সে লাশ আহ-উহ করে না। নিস্তেজ, নিঃস্তব্ধ, অসাড়। অথচ বিপরীত পক্ষে রূহ ধারণ করে আছে যে দেহ, সে দেহ যত রোগা ও দুর্বল থাকুক না কেন, হালকা একটি চিমটি দিলেও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে। তাহলে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, রূহটিই হলো মূল। দেহে রূহ থাকলেই অনুভূতি থাকে। অতএব আযাব, শান্তি, শাস্তি সবই রূহের সঙ্গে যুক্ত। রূহবিহীন খাঁচার কোন মূল্য নেই বলেই খাঁচার ওয়ারিশরা দ্রুত এ খাঁচাকে কবরস্থ করেন। ইসলামের বিধানও তাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কবরস্থ করতে হবে। এ কথা কি আমরা মেনে নেব না যে, যে রূহের শাস্তি আল্লাহ কবরে দিতে পারেন দেহসহ,

www.nagorikpathagar.org

এ আল্লাহ কি রূহকে দেহবিহীন অবস্থায় কবরের বাহিরে শাস্তি দিতে পারেন না? যে আল্লাহ দেহ ও রূহ পয়দা করেছেন, সে আল্লাহ এই রূহকে আবার তার দেহ তৈরি করে আযাবের স্বাদ পরখ করাতে কি পারেন না? অতএব আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি, আহমদ শরীফের লাশ, আহমদ শরীফ নন। আসল আহমদ শরীফ হচ্ছে তার রূহ, যা চলে গেছে হাসপাতালে যাওয়ার পথেই।

ডঃ আহমদ শরীফ গত ২৩শে ফেব্রুয়ারি (১৯৯৯) মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১টা ৪০ মিনিটে হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। অবশ্য হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হলে কেউ বাঁচে না। সুতরাং এটা কোন রোগ নয়। হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া চালু অবস্থায় কেউ মরে না এবং এ অবস্থায় কাউকে মৃত ঘোষণাও করা হয় না। যা হোক, ডঃ আহমদ শরীফের মৃত্যুর তারিখ ও বার ইংরেজি ক্যালেন্ডারের সময় অনুযায়ী ২৪শে ফেব্রুয়ারি এবং বার বুধ হওয়ার কথা। কারণ, রাত ১২টার পর থেকেই অন্য বার শুরু হয়। তিনি মারা যান ১টা ৪০ মিনিটে। এ সময়টাকেও সঠিক সময় বলা যায় না। চিকিৎসকদের থেকে মৃত্যু ঘোষণা এসেছে ১টা ৪০ মিনিটে। তিনি বাসা থেকে রওয়ানা হয়ে হাসপাতালে আসার পথে কত মিনিটে কোন্ জায়গা অতিক্রম করা অবস্থায় মারা যান, তা কেউ বলতে পারেন না। তবুও ধরে নিলাম তিনি ২৪শে ফেব্রুয়ারি বুধবার রাত ১টা ৪০ মিনিটেই মারা গেছেন।

তিনি জন্মগ্রহণ করেন চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ার সুচক্রদন্ডী গ্রামে ১৯২১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি রোববার। এই হিসাবে তিনি এই দুনিয়াতে বেঁচেছিলেন প্রায় ৭৮ বছর। জীবনের এই মুদ্দতে তিনি ৪০ খানা মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন, যার অধিকাংশই বিতর্কিত। জীবিত থাকতেই তিনি চোখ দিয়েছেন সন্ধানীকে। আর খাঁচাটা দিয়েছেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার জন্য। কিন্তু রূহটা তিনি কোনও সংস্থায় দান করেননি বা দানের চিন্তাও করতে পারেননি। তিনি হয়তো মনে করেছিলেন, এ ক্ষেত্রে কোন বক্কর-চক্কর কাজে লাগবে না। এ রূহটা যিনি দিয়েছেন, তিনি সেটা ফেরত নিয়েছেন। মালেকুল মউতের কাছে কোন যুক্তি খাটে না। মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে তার ধারণা কি ছিল, তা অনেকেই জানেন। এ জন্য বোধহয় তার মৃত্যু সংবাদ শুনে কেউ ইন্নালিল্লাহও পড়েননি। যিনি ইন্তেকাল করেননি, তার ওপর ইন্নালিল্লাহ পড়ার তো প্রশ্নই উঠে না। মুসলিম নামের যে কোন মুরতাদ বা নাস্তিক মারা গেলে টেলিভিশনে সংবাদ পরিবেশনের প্রায় শুরুতেই ইন্নালিল্লাহ উচ্চারণ করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু আহমদ শরীফের ব্যাপারে দেখা গেল ইন্নালিল্লাহ ছাড়া মৃত্যুর খবর পরিবেশন করা হয়।

তিনি নাকি মানবতাবাদী ছিলেন। হ্যাঁ, যারা সব বাদ দেয়, তারা শেষ অবলম্বন হিসাবে একটি 'বাদ'ই নিয়ে থাকে। আর সেটা 'মানবতাবাদ'। তিনি যখন এতই মানবতাবাদী ছিলেন, জীবিতাবস্থায় তার উচিত ছিল শিয়াল-শকুনের আহার হিসাবে নিজ দেহ ওয়াকফ করে যাওয়া। তাহলে মানবতাবাদী হওয়ার সাথে সাথে তিনি পশুপাখীবাদীও হতে পারতেন। আমাদের বন-জঙ্গলের পশুদের আহারের বড়ই অভাব। এই বিরাট দেহ তাদের কয়েক দিনের খোরাক হতো। ডঃ আহমদ শরীফের মৃত্যুর আদর্শ অনুসরণ করে দেশের যে সব নাস্তিক মরবে তাদের উচিত হবে মৃত্যুর আগে নিজ নিজ দেহ সুন্দরবনের পশুপাখীর আহার হিসাবে দান করে যাওয়া। তাহলে তারাও মরার পর মানবতাবাদী হওয়ার সাথে সাথে পশুবাদী বলে গণ্য হবেন। তিনি লাশটাকে এমন এক স্থানে কাটাকুটার জন্য দিলেন, যেখানে লাশের কোন অভাব নেই। অনেক লাশ ওয়ারিশরা নিতেও আসে না। তাছাড়া লাওয়ারিশ লাশ এ দেশে অনেক পাওয়া যায়। এদিক দিয়ে চিন্তা করলে মনে হয়, তার লাশের সযত্ন ব্যবহার হবে মাত্র কয়েক দিনের জন্য। তার রূহ আসল ঠিকানায় ঐ রাতে ১টা ৪০ মিনিটে চলে গেছে। এখন এই রূহটি আসল কায়ায় প্রবেশ করে বিগত ৭৮ বছরের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। তিনি নিজের ব্যালেন্সশীট নিয়েই অত্যন্ত বিপদে আছেন। অডিও-ভিডিও করা পূর্ণ জীবন-ফিল্ম এখন তিনি দেখছেন আর উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত হয়ে আযাবের কঠিনতম জ্বালায় জ্বলছেন ও ভুগছেন।

ডঃ আহমদ শরীফের চিন্তাধারা তথা জীবন দর্শনে বিশ্বাসী এ দেশে অনেকেই আছেন। তারা যদি ডঃ আহমদ শরীফের মত বে-ঈমানে পাক্কা ঈমানদার হন আর তারই মত সমআদর্শে আদর্শবান হন, তাহলে এই আদর্শবানরা নিজেদের দেহ বন-জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার, শিয়াল-শকুনদের জন্য দান করে যেতে পারেন। ডঃ আহমদ শরীফের মত হাসপাতালে দান করলে নতুন ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে।

ডঃ আহমদ শরীফ যে মুসলিম নামের অন্যান্য নাস্তিকের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম নাস্তিক, তিনি তা প্রমাণ করে গেলেন। আমার মনে হয়, তিনিই বাংলাদেশের একমাত্র ব্যতিক্রম নাস্তিক, যার কথার সঙ্গে কাজের মিল আছে, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ক আছে। এমন নাস্তিক বাংলাদেশে আমার জানা মতে আর একজনও

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন না। বাংলাদেশে মুসলিম নামের যত নাস্তিক এ পর্যন্ত মারা গেছেন, তাদের কোন একজনও মৃত্যুর আগে এ কথা ঘোষণা করেননি যে, আমার মৃত্যুর পর আমার লাশ ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী যেন সমাহিত করা না হয়। আমার লাশ যেন গবেষণার জন্য হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয়। এই রাজধানীর বড় বড় সব নাস্তিক বায়তুল মোকাররম এসে জানাযা নিয়েছেন। এর অর্থ হলো, জীবিত থাকতে মৃত্যুর পর তারা জানাযা না নেয়ার কথা ঘোষণা করেননি। ডঃ আহমদ শরীফ ছাড়া আর কোন নাস্তিককে (যারা মারা গেছেন) কথায়, কাজে বা জীবনে-মৃত্যুতে এক দেখিনি। প্রত্যেকেই জীবনের বিশ্বাসের সঙ্গে মৃত্যুর মধ্যদিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এ দ্বারা এ সত্যই প্রমাণিত হয় যে, তারা জীবিত থাকতে মানুষের মাঝে যা বলে বেড়াতেন বা মানুষকে যে পথে আসার আহ্বান করতেন, তারা কিন্তু তলে তলে প্রচারিত বা অনুশীলিত বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন না। অথবা এও হতে পারে যে, জীবিত থাকাকালীন তাদের বিশ্বাসের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাদের মরণের পর বুঝতে পারলাম, জীবিতকালীন তাদের যে বিশ্বাস ছিল, তা ছিল বৈষয়িক স্বার্থনির্ভর। জীবন-জীবিকা, হালুয়া-রুটির ব্যবস্থা মাত্র। অর্থাৎ কন্ট্রাস্ট, বৈপরিত্যের জীবন; মৃত্যুর পর ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা দ্বারা তাদের সমাহিত হওয়া কন্ট্রাস্টের নগ্নরূপ।

আহমদ শরীফ বাংলাদেশের সকল নাস্তিকের জন্য এক মডেল। যে মডেল অন্যান্য নাস্তিকের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। বাংলাদেশের সর্বস্তরের নাস্তিকদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, আপনারা নিজ নিজ বিশ্বাসের প্রতি পূর্ণ ঈমানদার হয়ে যান। মুনাফিকের চরিত্র ত্যাগ করুন। আহমদ শরীফের আদর্শকে আপনারা মডেল হিসাবে গ্রহণ করে ঘোষণা করুন, আমরা কোন ধর্মে বিশ্বাস করি না। মৃত্যুর পর আমাদের লাশ যেন কোন ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী সৎকার না হয়। আমাদের এত লাশ যদি হিমঘরে রাখার মত জায়গা না হয়, তাহলে সুন্দরবনে রেখে আসবেন অথবা লাশগুলোর ওপর বিভিন্ন দাহ্য কেমিক্যাল ছিটিয়ে ধ্বংস করে দেবেন। মৃত্যুর পর আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব যেন আমাদের উদ্দেশে কখনো কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান না করেন।

তারা এ ঘোষণা করতে পারেন সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ইশতেহার প্রকাশ করে, বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে তাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে। অথবা তারা ব্যক্তিগতভাবেও নিজ নিজ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন। তাতে দুটি সুফল পাওয়া যাবে।

www.nagorikpathagar.org

১. কেউ তাদের মুনাফিক বলবে না, নিজ আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলবে না, নাস্তিক্য আদর্শে তারা যে নিষ্ঠাবান ছিলেন না, এ কথা বলার মত সুযোগও কেউ পাবে না। ২. দ্বিতীয় সুফল হচ্ছে এই, আমাদের গোরস্থানগুলোতে এমনিতেই 'ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই' অবস্থা। তারা এমন ঘোষণা দিলে গোরস্থানগুলোর উপর চাপ কম পড়বে। অপরপক্ষে তাদের লাশগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করে ময়লা-আবর্জনায় রূপান্তরিত করে অনেক খাদ-খন্দক ভর্তি করা যাবে।

সুতরাং তাদের উচিত, আর কালবিলম্ব না করে ডঃ আহমদ শরীফের আদর্শ অনুসরণ করে অনুরূপ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা। এ চিন্তাধারায় যারা দৃঢ় বিশ্বাসী বলে দাবি করেন, তারা প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে এই দৃঢ়তার প্রমাণ রাখুন। তাহলে মুসলমানদের প্ল্যাটফরম অনেকটা আবর্জনামুক্ত হয়। আস্তিক নাস্তিক চিনতেও ভুল করবে না কেউ। ডঃ আহমদ শরীফের এই ঘোষণা থেকে তারা শিক্ষা লাভ করতে পারেন, যারা আমাদের মধ্যে আছেন খলল্ ঈমান নিয়ে, তারা ডঃ আহমদ শরীফ থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন যে, ডঃ শরীফ তার ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের প্রতি যদি এত সুদৃঢ় হতে পারেন, তাহলে তারা তাদের ছহী-শুদ্ধ ঈমানের প্রতি ডঃ শরীফের চেয়ে দ্বিগুণ ঈমানদার হতে বাধা কোথায়? ঈমানদার দাবি করলে হতে হবে পাক্কা ঈমানদার। আর যদি বে-ঈমানদার হতে হয় তাহলে ডঃ আহমদ শরীফের মত পাক্কা বেঈমানদার হতে হবে নিজ বেঈমানীতে। আল্লাহ বলেন, পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হয়ে যাও। এখানে পার্ট টাইম বা আংশিক দাখিলের কোন অবকাশ নেই এবং তা গ্রহণও করা হয় না।

ডঃ আহমদ শরীফকে ধন্যবাদ তার বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্য। একটা অনাকাংখিত লাশের জায়গা দেয়া থেকে গোরস্থান তো বাঁচলো। আমি তাকে ধন্যবাদ দেই আর একটি কারণে। তা হচ্ছে, নাস্তিক্যবাদের জনক বা গুরুকেও তিনি আদর্শের প্রতিযোগিতায় হারাতে সক্ষম হলেন। তার গুরু কার্ল মার্কস মরার পর গোরে গিয়ে প্রবেশ করেছেন। বিলেতে তার কবর এখনও বিদ্যমান। ডঃ শরীফ গুরুর স্তরও অতিক্রম করলেন। তিনি অবশ্য লেনিনের পথ অনুসরণ করেছেন। কিন্তু লেনিনের লাশ ৭৬ বছর ধরে রাশিয়া জোড়াতালি দিয়ে শুইয়ে রাখছে। কিন্তু আহমদ শরীফের লাশ কোন্ ময়লার ভাগাড়ে চলে গেছে, তা কে জানে? লাশের পরিণতি যাই হোক, তিনি যে হিপোক্রেট নাস্তিক নন, নাস্তিক্যবাদে গুরু মারা বিদ্যা ও নিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তা তিনি প্রমাণ করে গেলেন। ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বুকে তার নাম স্থান পাওয়া উচিত ছিল।

www.nagorikpathagar.org

একটি লাশই এক ইতিহাস

[ডঃ আহমদ শরীফ মৃত্যুর পরই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন]

[আগের লেখাটি শেষ করার পর একটি জাতীয় দৈনিকে দেখলাম, তার লাশ কোন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা নিচ্ছে না। শুধু তাই নয়, আরও কিছু কিস্‌সা-কাহিনী শুনলাম, তাই এই লেখাটি লিখতে হলো-লেখক]

একটি লাশ নিয়ে কেন এত ঝামেলা হচ্ছে? এই কেন-এর মন-পছন্দ উত্তর পাচ্ছি না। একজন সাধারণ মানুষের লাশ নয়, এ লাশ ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক অধ্যাপকের। যিনি বাম বুদ্ধিজীবী তালিকাভুক্ত এবং মানবতাবাদী বলেও কথিত। আমি ডঃ আহমদ শরীফের লাশের কথাই বলছি। আহ! বেচারার লাশের কি দুর্গতি! না গেলেন তিনি গোরে, না গেলেন শ্মশানে, না থাকতে পারছেন শান্তিতে কোন হাসপাতালের লাশ কাটা হিমঘরেও। কোথাও তার ঠাঁই নেই। কেন তাকে কেউ জায়গা দিচ্ছে না বা কোথাও তার জায়গা হচ্ছে না? তার মত এক ব্যক্তির লাশ তো সবখানে জায়গা হওয়া উচিত ছিল। অতি সাধারণ যে লাওয়ারিশ লাশ রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে, সে লাশেরও একটা হিল্লা হয়। আর আনজুমানে মুফিদুল ইসলামের নজরে পড়লে তার একটা সৎকার অবশ্যই হয়। কিন্তু আফসোস! ডঃ আহমদ শরীফের ক্ষেত্রে আনজুমানে মুফিদুল ইসলামও কোন কিছু করার সুযোগ পেল না। কোন গোরস্তান বা শ্মশান কর্তৃপক্ষও আপোস রফার কোন চান্সই পাননি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও পড়েছেন বেকায়দায়। লাশ কেউ নিচ্ছেন না। জীবিত থাকতে যার এত কদর ছিল, যিনি প্রায় এক ডজন সংস্থা, সমিতি ও সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তার লাশটার যে এমন অবস্থা হবে তা কি কেউ কখনো কল্পনা করেছেন? ডঃ আহমদ শরীফও কি যে ভুল করেছেন, মৃত্যুর পর এখন তিনি সেই ভুল বুঝতে পারছেন। কিন্তু সেই ভুলের তো আর সংশোধন নেই।

এ সম্পর্কে ৭ই মার্চের (১৯৯৯) দৈনিক সংগ্রামে ডঃ আহমদ শরীফের ঝুলন্ত লাশের যে খবর ছাপা হয়েছে, তা যেমন কৌতুকবহ, তেমনি বেদনাদায়ক। আমার জানা মতে, এ দেশে এ ধরনের কোন ব্যক্তির লাশ নিয়ে *ঠেলাঠেলি* আর হয়নি। খবরে প্রকাশ, ডঃ আহমদ শরীফের লাশ নিয়ে বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মারা যাওয়ার ১০ দিন পর তার মৃতদেহ নিয়ে সৃষ্টি হয় এক অদ্ভুত জটিলতা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের গবেষণা কর্মের জন্য জীবদ্দশায় তিনি তার লাশ দান করে গেলেও ছাত্ররা এখন তাতে হাত লাগাতে চাচ্ছে না। গত

www.nagorikpathagar.org

চার দিন ধরে তার মৃতদেহটি নিয়ে দুই মেডিক্যাল কলেজে ঠেলাঠেলি চলছে। ডঃ আহমদ শরীফের ইচ্ছা অনুযায়ী (২৮শে ফেব্রুয়ারি) ধানমন্ডির বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের এনাটমী বিভাগের প্রধান প্রফেসর এম আর সরকারের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়। মৃত্যুর পর পরই তার চোখের কর্ণিয়া খুলে নেয় সন্ধানী। পরে এই কর্ণিয়া এক মহিলা এবং এক অন্ধ হাফেজের চোখে লাগানো হয়। অন্ধ হাফেজ বলেন, 'নাস্তিকের চোখ আগে জানলে তো আমি নিতাম না।' তাকে না জানিয়েই কর্ণিয়াটি সংযোজন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রী তাদের গবেষণা কর্মের জন্য আহমদ শরীফের লাশে হাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি এই অবস্থায় তার মৃতদেহটি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু ঘোরতর আপত্তি উঠেছে সেখান থেকেও। শিক্ষার্থীরা কিছুতেই এই লাশ গ্রহণ করতে রাজি হচ্ছেন না। অগত্যা আবার তার মৃতদেহটি বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এখন এই লাশ নিয়ে পড়েছেন মহা ফ্যাসাদে। ছাত্রদের বক্তব্য হলো, 'যে লোক জীবদ্দশায় আল্লাহকে অস্বীকার করেছেন, এমন ব্যক্তির লাশে তারা হাত দেবেন না'।

এই সংবাদ পাঠ করার পর আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। বেচারা ডঃ আহমদ শরীফ তার লাশের হাল-অবস্থা দেখে নিশ্চয়ই ভীষণভাবে বেদনাহত হয়েছেন এবং ভাবছেন নানা কথা। কি ভাবছেন তিনি? এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে এক শ্রেণীর জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক নাকি ডঃ আহমদ শরীফের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করে ইন্টারভিউ নিয়েছেন। শুনেছি, মৃত্যুর পর অনেকের আত্মা নাকি প্রেতাত্মায় পরিণত হয়। এসব আত্মা কোথাও ঠাঁই পায় না, শুধু ঘুরে বেড়ায়। কোন কোন জ্যোতিষ বা তান্ত্রিক নাকি কি কি তন্ত্র-মন্ত্র বলে আত্মাকে হাজির করে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন। আরও শুনেছি, এ ধরনের একটা শাস্ত্র নাকি আছে এবং এ লাইনে সাধনাও কেউ কেউ করেন। বাজারে তথা পাবলিকের মধ্যে একটা কথা ছড়িয়ে পড়েছে যে, ডঃ আহমদ শরীফ কোথাও ঠাঁই না পেয়ে স্বপ্নযোগে কোন কোন স্বজনকে প্রেতাত্মার রূপ ধরে রাতে জ্বালাতন করেন। কোন কোন জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মন্ত্রের জালে আটকিয়ে তার থেকে বিলাপ শুনেছেন। স্বপ্নের ইন্টারভিউ, আত্মার আহাজারি আর বিলাপের ভাষা ও কাহিনী নানা জনের মধ্যে নানাভাবে নানা রূপে ছড়িয়ে পড়েছে। গভীর রাতে যারা চলাফেরা করেন, তাদের কারো কারো সাথে নাকি দেখাও হয়ে যায়। শোনা

www.nagorikpathagar.org

যায়, বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অশরীরী এই আত্মা ঘুরাফেরা করে। বিশেষ করে রাতের বেলা ডিউটিরতদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

তিনি নাকি তার মতাদর্শী কোন এক স্বজনের কাছে সম্প্রতি দুঃখ করে (স্বপ্নে) বলেছেন, আগে যদি জানতাম আমার লাশের এমন দশা হবে, তাহলে শ্মশানে পুড়েই মরার কথা ঘোষণা করতাম। বাংলাদেশে পুড়ে মরা অসুবিধা হলে কলকাতার কোন শ্মশান ঘাটে নিজেকে জীবিত অবস্থায়ই বুকিং করে রাখতাম। আমি কি এতই ফেলনা যে, কোন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের হিমঘরেও আমার লাশের ঠাঁই হয় না?

স্বজন বলেছেন : আমরা তো চেষ্টা কম করছি না স্যার, কিন্তুকি করবো বলুন, কোন হাসপাতালই তো গ্রহণ করে না।

আহমদ শরীফ : এ দেশে আমিই তো প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলাম। এমন তো আর কেউ করেনি। তোমরা কোনভাবে ম্যানেজ করে আমার লাশটা রাখার ব্যবস্থাটা করো।

স্বজন : আপনি মস্তবড় ভুল করেছেন স্যার। আপনি তো এক নম্বর নন, দুই নম্বর। আপনার আগের নাম্বার বরিশালের এক ভদ্রলোকের। কেন আপনি নিজের লাশকে এভাবে দান করে গেলেন? বাংলাদেশে কি লাশের অভাব আছে? কত রোগী হাসপাতালে মরে পড়ে থাকে। কোন কোন মৃত রোগীর গরিব ওয়ারিশরা লাশ নিতেও আসে না। কারণ, দাফন-কাফন তো খুব ব্যয়বহুল কিনা। এছাড়া লাওয়ারিশ লাশের তো অভাব বাংলাদেশে নেই। আনজুমানে মুফিদুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারাই কত লাশ হাসপাতালকে দিতে পারে। আপনি এসব কথা জানেন। তবুও কেন নিজের লাশটা এভাবে দান করলেন?

আহমদ শরীফ : তোমার মাথায় ঘিলু 'বিলো এভারেজ' অর্থাৎ স্বাভাবিকের চেয়েও কম। কথাটা এ জন্য বললাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী এবং ডক্টরেট ডিগ্রিধারী আহমদ শরীফের মত দামি লাশ গবেষণার জন্য হাসপাতালে ক'টি আছে? এ লাশের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও মূল্য কি আলাদা নয়? সাধারণ লাশ ও লাওয়ারিশ লাশের সঙ্গে কি আমার লাশের তুলনা করো? বুদ্ধিসুদ্ধি কি তোমার নেই?

স্বজন : বুদ্ধি আমার ঠিকই আছে, আর আমার স্বাভাবিক বুদ্ধিই বলছে, সাধারণ লাশ, লাওয়ারিশ লাশ আর আপনার লাশের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

www.nagorikpathagar.org

আপনার দেহে যেমন দুটি কিডনি আছে, তাদের প্রত্যেকের দেহে দুটি কিডনি আছে। আপনার লাশ কাটাকুটি করলে এমন কি বস্তু অতিরিক্ত পাওয়া যাবে যা তাদের দেহে নেই? বরং আপনার এই ৭৮ বছরের বুড়া দেহের অনেক কলকব্জা অকেজো হয়ে পড়েছে। গবেষণার জন্য এই বুড়া দেহ উপযোগীও নয়।

আহমদ শরীফ : আমার দানের এই কি প্রতিদান? জীবিত থাকতে যখন ঘোষণা করেছি, তখন তো তোমরা বাধা দাওনি বরং তখন হাততালি দিয়েছ। সে সময় কেন এসব কথা বলোনি?

স্বজন : আমাদের সঙ্গে যুক্তি করলে অন্য পরামর্শ দিতাম। আপনি তো আবেগে এ ঘোষণা দিয়েছেন বিখ্যাত হওয়ার জন্য। এখন তো দেখতে পারছেন আপনার লাশের কি অবস্থা? বিখ্যাত হওয়া তো দূরের কথা, মূল মহাজনীও যায়।

আহমদ শরীফ : আগে পরামর্শ করলে তোমাদের পরামর্শটা তাহলে কি হতো?

স্বজন : আমি সাফ সাফ জবাবে বলতাম, আমাদের গুরু কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পরবর্তী কর্মসূচি অনুসরণের জন্য। মৃত্যুর পর তাকে সমাহিত করা হয়। আপনি কেন তার চেয়েও কয়েক ডিগ্রি উপরে উঠতে গেলেন? নাস্তিকদের মরার পর সৎকারের তো আলাদা কোন বিধান কার্ল মার্কস, এঙ্গেল, লেনিন, স্টালিন কেউ দিয়ে যাননি। তাদের প্রত্যেকেই (লেনিন ছাড়া) মৃত্যুর পর দেশীয় ও ধর্মীয় প্রথায় সমাহিত হয়েছেন। আপনি কেন ব্যতিক্রম ধারা সৃষ্টি করে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে গেলেন? দুনিয়ার প্রত্যেক নাস্তিকই মৃত্যুর পর ধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করে থাকে। আমাদের দেশের প্রত্যেক নাস্তিকই এ ধারার এক একটি দৃষ্টান্ত। আপনি দেখেননি এ দেশের নাস্তিকরা তাদের ওয়ারিশের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী গোরে বা শ্মশানে যায়?

আহমদ শরীফ : আমি চেয়েছিলাম একটা স্বতন্ত্র নিয়ম সৃষ্টির।

স্বজন : আপনার স্বতন্ত্র নিয়মের ঠ্যালাটা এবার বুঝুন। খামোখা আমাদের ঝামেলায় ফেলছেন। আমরা এখন কি করতে পারি বলুন?

আহমদ শরীফ : আমি এই ঘোষণা না দিলে তোমরা আমাকে গোরে নিয়ে যেতে। সেখানে মৌলবাদীরা গোলমাল করতো। হিন্দুরাও নিত না আমাকে শ্মশানে। এই ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্যই তো এই করলাম।

www.nagorikpathagar.org

স্বজন : এবার বলুন, আপনার লাশের কি ব্যবস্থা আমরা করতে পারি?

আহমদ শরীফ : আমার পৈত্রিক জেলার কোন এক পাহাড়ে বা টিলায় গর্ত করে মিসরের ফেরাউনের মত আমার লাশকে মমি করে রেখে দাও।

স্বজন : এত অর্থ আমরা কোথায় পাবো?

আহমদ শরীফ : তোমরা তো আমার গুণগ্রাহী। সবাই মিলে এতটুকু ত্যাগ স্বীকার কি করতে পারবে না? তসলিমা আর রুশদীর শরণাপন্ন হলে আশা করা যায় মোটা অংকের সাহায্য পাবে। জীবিত থাকতে ওদের পক্ষে বিবৃতি দিয়েছি।

স্বজন : আবার চেষ্টা করে দেখি কোন হাসপাতালে একটুখানি জায়গা পাওয়া যায় কিনা। সরকার যেহেতু আমাদের, একটা ব্যবস্থা হয়তো হয়ে যেতে পারে। তবে সরকার স্বেচ্ছায় লাশের কোন দায়িত্ব নেবে না।

আহমদ শরীফ : বিদেশে তো কত আস্তিক-নাস্তিকের লাশের ওপর গবেষণা হয়, লাশ তারা স্পর্শ করে কাটাকাটি করে, কোন ছাত্রতো লাশ নিয়ে নাস্তিক-আস্তিকের প্রশ্ন তোলে না। এখানে কেন এ প্রশ্ন উঠছে এবং প্রশ্ন উঠছে আমার লাশকে নিয়েই? কেন আমাকে নিয়ে এই উল্টা বাতাস বইছে?

স্বজন : আপনার নাম যে আহমদ শরীফ। জীবিত থাকতে কেন এত বাড়াবাড়ি করলেন? তারা এখন সেই বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ নিচ্ছে। যারা আপনার নামে তখন অন্ধ ছিল, কারণে-অকারণে আপনার রেফারেন্স টানতো, তারা এখন আপনার লাশের ঝামেলা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে থাকছে। তাদের জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমরা লাশের ঝামেলায় নেই।

আহমদ শরীফ : তোমার মধ্যেও দেখছি এমন একটা মানসিকতা কাজ করছে।

স্বজন : না, কথাটা ঠিক তাই,নয়। তবে আমিও এই খামোখা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চাই না।

আহমদ শরীফ : যে ভুল আমি করেছি। তোমরা আর এমন ভুল করো না। তোমাদের জন্য আমার উপদেশ, নাস্তিকদের জন্য আলাদা গোরস্তান তৈরি করো। সে গোরস্তানে শুধু মুসলিম নামযুক্ত নাস্তিকদের মাটি চাপা দেয়া হবে জানাযা ছাড়া।

স্বজন : গুরু, তাতেও কিন্তু বিপদ আছে। বিরুদ্ধবাদীরা সেই গোরস্তানে পেশাব-পায়খানা করে অপবিত্র করে ফেলবে। মক্কায় আবু জেহেলের বাড়িকে টয়লেট হাউসে পরিণত করা হয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

আহ্‌মদ শরীফ : আমার লাশের কোন হিল্লা করতে না পারলে গোটা লাশকে কোন হাই পাওয়ার তরল ক্যামিকেলে ডুবিয়ে তরল পদার্থে পরিণত করে ড্রেনে ঢেলে দিও। আর আমার কংকাল আমার বাসার ফটকে লম্বা তিন বাঁশের মিলিত অগ্রভাগে উঁচু করে ঝুলিয়ে রাখবে। আমার কংকালের এ দৃশ্য দেখে অনেকেই শিক্ষা নেবে। কারণ, আমি যে মানবতাবাদী। মরেও তোমাদের শান্তিতে থাকতে দেবো না। স্বপ্নে এসে জ্বালাতন করবো।

ফজরের আযানের মধুর সুর ভেসে আসে। আযান শুনলে শয়তান আর প্রেতাত্মারা পালায়। আযানের আওয়াজ শুনে ডক্টর সাহেব কেটে পড়েন। স্বজন চমকে উঠে। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

ডঃ আহ্‌মদ শরীফের এই আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকের সঙ্গে নাকি দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, নিজ ভুলের স্বীকারোক্তিও করছেন। গভীর নিশিতে নাকি কেউ কেউ ডঃ আহ্‌মদ শরীফের মোটা গলায় শোনেন (ঈষৎ পরিবর্তিত) গানের সেই কলিগুলো কান্না বিজড়িত কণ্ঠে, যাতে রয়েছে-

ভুল ভুল ভুল
সবই ভুল
এ জীবনের পাতায় পাতায়
যা কিছু ছিল লেখা
তাও ছিল ভুল।
আর কেউ করো না
এমন সর্বনাশা ভুল।

পরিবারের কথা : সন্ধানী ২৪শে ফেব্রুয়ারি ভোর ৬টা তার চোখ নিয়ে গেল, ২৮শে ফেব্রুয়ারি দেহটি নিয়ে গেল বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। অবশিষ্ট আর কিছুই থাকলো না। থাকলো শুধু একটি ইতিহাস, সে ইতিহাস নিয়ে দু'দশজন গর্ব করেন। কিন্তু কোটি কোটি লোক সেই ইতিহাসের ওপর ঘৃণার থু থু নিক্ষেপ করেন। তার পরিবার কিন্তু এ ইতিহাস গর্বের সাথে মেনে নিয়েছে। ডঃ শরীফের আদর্শে গড়া পরিবার কর্তার আদর্শপন্থী তো হবেই।

ডঃ শরীফের তিন ছেলে। এরা হলেন মেঘনা পেট্রোলিয়াম কোম্পানির

www.nagorikpathagar.org

এরিয়া সেলস অফিসার মাহমুদ করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ নেহাল করিম ও সুপ্রিম কোর্টের এডভোকেট জাহেদ করিম। তারা বলেন, বাইরের কিছু লোক ও আত্মীয়স্বজন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার জন্য আমাদের কাছে অনুরোধ করেন। কিন্তু আমরা তিন ভাই বাবার নির্দেশ পালনে সংকল্পবদ্ধ ছিলাম। আমাদের বাড়িতে কোন ধর্মকর্ম পালন করা হয় না। তবে কুরবানি হয়। কুরবানির ব্যাপারে বাবা কোন বাধা দেননি। আমাদের ভাইদের নামে কুরবানি হয় না, কিন্তু ভাবীদের নামে হয়। [দৈনিক মানবজমিন, ১১ই মার্চ, ১৯৯৯]

দু'চোখ : ডঃ আহমদ শরীফের দু'কর্ণিয়ায় যে দুজন অন্ধ আলো পেয়েছেন তারা হলেন মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার করটিয়া গ্রামের হাফেজ খায়রুল আলম খোকন ও পুরান ঢাকার আবুল হাসনাত রোডের এক মহিলা।

www.nagorikpathagar.org

সরদার আলাউদ্দিন

সিলেট মুরারী চাঁদ সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন সরদার আলাউদ্দিন। ১৯৮১ সালের কথা। লেখালেখির হাত ছিল তাঁর। তবে সে হাত ভাল ছিল, না মন্দ ছিল, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। তিনি স্থানীয় পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। হঠাৎ তার মনে বাসনা জাগলো, তিনি দেশময় পরিচিত হবেন। এই প্রবল ইচ্ছাটা তাকে অস্থির করে তুললো। তার সামনে দুটি পথ ছিল খোলা। একটি ছিল সুখ্যাতি অর্জনের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়টি ছিল কুখ্যাতি অর্জনের মাধ্যমে পরিচিত হওয়া। তিনি হয়তো ভাবলেন, প্রথম পথ বন্ধুর, কঠোর সাধনার পথ, তীব্র প্রতিযোগিতার পথ। এ পথে চলে লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। চিন্তার এ পর্যায়ে শয়তান তার ঘাড়ে সওয়ার হলো। শয়তান তার উপদেষ্টা হলো। অভিশপ্ত শয়তান তাকে বললো, আলাউদ্দিন, তুমি পারবে না প্রথম পথে চলে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌঁছতে। তুমি দ্বিতীয় পথ ধরো, রাতারাতি তুমি পরিচিত হয়ে উঠবে। তুমি হবে সকলের আলোচ্য ব্যক্তিত্ব। টক অব দ্য ন্যাশন হয়ে থাকবে অনেক দিন। ইতিহাসে তোমার নাম ও তোমার কীর্তি অবশ্য কাহিনী আকারে অন্তর্ভুক্ত হবে।

আলাউদ্দিন বললেন, ঠিক আছে সে পথই আমি বেছে নেব। কিন্তু এবার বলো, আমাকে কি করতে হবে।

শয়তান বললো, খুব তাড়াতাড়ি মানুষের মুখে মুখে আর পত্রপত্রিকায় শিরোনামে আসতে হলে আঘাত হানো কুরআনকে আর মুহাম্মদকে। তৈরি করো একটা লেখা। সে লেখার নানা আলোচনার ফাঁকে বলে দাও, কুরআন মুহাম্মদের রচিত। তাহলে জনগণ তোমাকে চিনবার ও দেখবার জন্য অস্থির হয়ে পড়বে।

আলাউদ্দিনের ভীত বিহ্বল আবেদন, আমার প্রাণনাশের ভয় আছে তাতে। শয়তানের সাফ জবাব, 'নো রিস্ক নো গেইন।'

সরদার আলাউদ্দিন রাজি হলেন। তিনি রচনা করলেন 'প্রবৃত্তি ও মহত্ত্ব'

www.nagorikpathagar.org

শিরোনামে এক নিবন্ধ। এই নিবন্ধের এক স্থানে লেখকের মন্তব্য ছিল এই, 'মুহাম্মদ অবস্থা, ব্যবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া একখানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন, যাহার নাম কুরআন'। এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় সিলেটের সাপ্তাহিক সমাচারে ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ সালে। এ মন্তব্যের প্রতিবাদ করে শহরের মুসলিম জনতা ২রা মার্চ (১৯৮১)। পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং লাঠিচার্জ করে। প্রথম দিনেই ৫০ জন আহত হয়, ২৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। জাতীয় দৈনিকগুলোতে এ খবর ছাপা হয়। ৩রা মার্চ মঙ্গলবার সিলেট শহরে হরতাল পালিত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক সরদার আলাউদ্দিন এতোই কি অজ্ঞ ছিলেন যে, যাকে তিনি কুরআন রচনাকারী বললেন, তিনি যে লেখাপড়াই জানতেন না, এমনকি নাম দস্তখতও জানতেন না, এ তথ্য ও সত্য কি তার জানা ছিল না?

সিলেটে কি ঘটেছিল?

অধ্যাপক আলাউদ্দিন সরদারের লেখা নিবন্ধটি সিলেট সমাচারে প্রকাশিত হয় ২৪শে ফেব্রুয়ারি (১৯৮১)। নিবন্ধটি প্রকাশের পর থেকে ১৩ই মার্চ পর্যন্ত সিলেট শহরে প্রায় প্রতিদিন যে সব ঘটনা ঘটছে, সে সব ঘটনার প্রতিদিনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও প্রাসঙ্গিক কথা নিয়ে দৈনিক সংবাদের বিশেষ প্রতিবেদক যে দীর্ঘ প্রতিবেদন তৈরি করেন, তা উপরোক্ত শিরোনামে দৈনিক সংবাদের ১৫ই মার্চ রোববার (১৯৮১) সংখ্যায় ছাপা হয়। আমি এই দীর্ঘ প্রতিবেদনটি কোন মন্তব্য ছাড়াই উদ্ধৃত করলাম (লেখক)।

সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সিলেট সমাচার পত্রিকার ২৪শে ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে পবিত্র কুরআন ও মহানবী (দঃ) সম্পর্কে অশোভন উক্তিকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি হিসেব অনুযায়ী ৩ জনের প্রাণহানি, শতাধিক আহত এবং সপ্তাহব্যাপী কারফিউজনিত পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

সিলেট জেলায় কোন আন্দোলনজনিত কারণে জন জীবনের এরকম অচলাবস্থা সৃষ্টি এর আগে আর কখনো হয়নি। '৫৪, '৬২, '৬৬ অথবা '৬৯-এর আন্দোলনগুলোতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হলেও সিলেটের জনগণের কাছে এত দীর্ঘ দিনের জন্য কারফিউ অভিজ্ঞতা একেবারে নতুন।

www.nagorikpathagar.org

এই আন্দোলনের ফলে সরকারিভাবে ৩ ব্যক্তির প্রাণহানির কথা স্বীকার করা হলেও অসমর্থিত খবর অনুযায়ী প্রাণহানির সংখ্যা আরো বেশি হতে পারে। পুলিশের সাথে জনতার সংঘর্ষকালে গত ২রা ও ৩রা মার্চ গ্রেফতার হয়েছে ৬৯জন। এদের মধ্যে ১৪ জনকে সাথে সাথে মুক্তি দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে কারফিউ চলাকালে আইন অমান্য করার দায়ে গ্রেফতার হয়েছেন আরো ২ জন।

যে জন্য আন্দোলন : ২৪শে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা সিলেট সমাচার-এর সাহিত্য পাতায় সিলেট এমসি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সরদার আলাউদ্দিনের লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির শিরোনাম 'প্রবৃত্তি ও মহত্ত্ব'। নিবন্ধটিতে কুরআন শরীফ ও মহানবী (দঃ) সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। ২৭শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার প্রতিটি মসজিদে এ নিয়ে আলোচনা হয় এবং এই বিষয়টির ব্যাপারে প্রতিবাদ জানানোর প্রস্তুতি শুরু হয়।

সিলেট সমাচার-এর সম্পাদক এই নিবন্ধটিতে এরকম উক্তি রয়েছে বলে জানতেন না, এ মর্মে কোন কোন মহল মন্তব্য করেন এবং প্রতিবাদ জানানোর প্রস্তুতির সংবাদ শুনে ২৭শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় একপাতার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। এই বিশেষ সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে অজ্ঞাতসারে এই মন্তব্য সম্বলিত নিবন্ধ প্রকাশের জন্য দুঃখ প্রকাশ এবং আল্লাহতায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়।

২৮শে ফেব্রুয়ারি দুপুরে সিলেট আলীয়া মাদ্রাসা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কিছু ছাত্রের একটি মিছিল সিলেট সমাচার কার্যালয় আক্রমণ করে। সেখানে উপস্থিত বশীর আহমদ নামক একজন সাংবাদিক এ আক্রমণে আহত হন এবং অফিস তছনছ হয়েছে বলে কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। এ ঘটনার পর থেকেই সমাচার কার্যালয়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

'ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ কমিটি' সিলেট সমাচারের উক্ত নিবন্ধটির পরিপ্রেক্ষিতে ২রা মার্চ প্রতিবাদ দিবস আহ্বান করে। তারা তাদের দাবিমালায় নিবন্ধ লেখক সরদার আলাউদ্দীনের ফাঁসি, সমাচার সম্পাদকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং সিলেট সমাচারের প্রকাশনা বন্ধও অন্তর্ভুক্ত করেন।

১লা মার্চ বিকেলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারণ) শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক সভা আহ্বান করেন। এতে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেয়া হয় এবং গৃহীত

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থাবলী জনসাধারণের কাছে প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়। অন্যদিকে প্রতিবাদ দিবসটি শান্তিপূর্ণভাবে পালনেরও আশ্বাস দেয়া হয়।

২রা মার্চের ঘটনা পূর্ব প্রস্তুতি অনুযায়ী বিকাল ৩টায় স্থানীয় রেজিস্ট্রারি মাঠে মাওলানা হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে 'ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ কমিটি'র প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিবন্ধ লেখক সরদার আলাউদ্দীনের ফাঁসি ও সমাচার সম্পাদকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, সমাচার-এর ডিক্লারেশন বাতিলসহ ইসলামী বিরোধী সকল প্রকার কার্যকলাপ বন্ধের দাবি জানিয়ে বক্তৃতা করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য খোন্দকার আব্দুল মালিক, সিলেটস্থ ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উপপরিচালক অধ্যাপক আফজাল চৌধুরী, পৌর চেয়ারম্যান জনাব বাবরুল হোসেন বাবলু ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ।

প্রতিবাদ সভা শেষে প্রায় দশ হাজার জনতার একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন পৌর চেয়ারম্যান জনাব বাবরুল হোসেন বাবলু ও মাওলানা হাবিবুর রহমান প্রমুখ। মিছিলটি শহর প্রদক্ষিণকালে অংশগ্রহণকারী জনতার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং দাঙ্গা দমনকারী পুলিশ ভ্যান থেকে মিছিলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল।

বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মিছিলকারী জনতা হাসান মার্কেটস্থ কথিত বাসস কার্যালয়ে হামলা চালায়। হামলায় কার্যালয়টির প্রচুর ক্ষতিসাধন করা হয়। এরপর মিছিলটি জিন্দাবাজারের দিকে রওয়ানা হলে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। উল্লেখ্য, জিন্দাবাজারের অদূরে তাঁতীপাড়ায় সিলেট সমাচার কার্যালয়। কর্তৃপক্ষ পূর্বেই তাঁতীপাড়ার সকল রাস্তায় পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি করেন।

জিন্দাবাজারে পুলিশ কর্তৃক মিছিল বাধাপ্রাপ্ত হলে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। এ সময় জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। উপর্যুপরি কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের ফলে জিন্দাবাজার এলাকায় অন্ধকার নেমে এলেও জনতাকে ঠেকাতে পুলিশকে বেশ নাকানিচুবানি খেতে হয়। এখানে গুলিবর্ষণেরও শব্দ শোনা যায়, কিন্তু পুলিশ কর্তৃপক্ষ গুলিবর্ষণের কথা অস্বীকার করেছেন। ঘটনায় প্রথম মৃত্যুবরণকারী আব্দুল করিম ওরফে দিলীপ আহত হয় জিন্দাবাজারেই। তার দেহে বুলেটের আঘাত ছিল বলে ডাক্তার অভিমত দেন।

সংঘর্ষ চলাকালে জনতা একটি সরকারি জীপে অগ্নিসংযোগ করে। দমকল বাহিনীর গাড়ি আগুন নেভাতে ছুটে এলে জনতা ঐ গাড়িতেও হামলা চালায়।

www.nagorikpathagar.org

এতে দমকল বাহিনীর ৬ জন কর্মী আহত হয়। জনতা নিকটস্থ বাংলাদেশ বিমান কার্যালয়েও হামলা চালায় এবং ক্ষতিসাধন করে।

সন্ধ্যার দিকে একশ্রেণীর লোক মিছিলে পুলিশি হামলা ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে বন্দরবাজারস্থ পুলিশ ফাঁড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। দমকল বাহিনী এখানেও আগুন নেভাতে ব্যর্থ হয়। পরে বালু পানি দিয়ে পুলিশের লোকরাই আগুন নেভাতে সক্ষম হয়।

রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত শহরের কেন্দ্রস্থলে এভাবে পুলিশ-জনতার সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। পুলিশ এ সময় মিছিল থেকে মোট ২৯ জনকে গ্রেফতার করে। অবশ্য ঐ রাতেই ১৪ জনকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, সংঘর্ষে ২/৩ জন পুলিশের লোকসহ মোট ২৩ জন আহত হয়। এদের মধ্যে আব্দুল করিম ওরফে দিলীপ মিয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঐ দিন ভোর সোয়া তিনটায় দিলীপ সিলেট হাসপাতালে মারা যায়। এদিকে রাতে জেলা প্রশাসন থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ১৫ জন পুলিশ আহত এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপের কথা স্বীকার করে বলা হয় যে, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে। তবে পর দিনের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে 'সিলেটের পরিস্থিতি থমথমে' বলে মন্তব্য করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ঐ দিন বিকাল ৫টা থেকেই শহরের সকল দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। জনজীবনে নেমে আসে আতঙ্ক। পাড়ায় পাড়ায় জটলা করে আহত-নিহতের সংখ্যা নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত চলে আলোচনা।

এদিকে জেলা কর্তৃপক্ষ ঐ রাতেই সিলেট সমাচার অফিস সীল, সমাচারের ডিক্লারেশন বাতিল, সমাচার সম্পাদককে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি ও লেখকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির কথা ঘোষণা করেন।

রাত সাড়ে ৯টায় জনতার শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে মাইকযোগে ৩রা মার্চ সিলেট শহরে পূর্ণ হরতাল আহ্বান করা হয়। হরতাল আহ্বানকারীদের কোন নাম ঘোষণা করা না হলেও পরে বিরোধী ১২টি রাজনৈতিক দল হরতাল আহ্বানের দায়িত্ব স্বীকার করে। এদিকে ভোর রাতে ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে এক মাইক ঘোষণায় দাবি মেনে নেয়া হয়েছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়, যা পরবর্তীতে সিলেট বেতার থেকে ঘন ঘন প্রচার হতে থাকে।

www.nagorikpathagar.org

৩রা মার্চ : গুলিবর্ষণ-কারফিউ : ভোর ছ'টা থেকেই শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হচ্ছিল। যানবাহন চলেনি, দোকানপাটও খুলেনি। হরতাল চলাকালে খাদ্য উপমন্ত্রী জনাব ইকবাল হোসেন চৌধুরী সিলেট এসে সার্কিট হাউসে উঠেন।

সকাল দশটার দিকে স্থানীয় হাসান মার্কেট পয়েন্টে দশটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সাম্যবাদী দলের নেতা জনাব আসাদ্দর আলীর সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়ে ধর্মপ্রাণ জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের নিন্দা করে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানান। সভায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে নিবন্ধ লেখক সরদার আলাউদ্দিনের শাস্তিও দাবি করা হয়।

বেলা সাড়ে এগারোটার সময় সুরমা ম্যানসনস্থ পয়েন্টে অপর একটি জনসভায় যখন সংসদ সদস্য খোন্দকার আব্দুল মালিক, পৌর চেয়ারম্যান বাবরুল হোসেন বাবুল প্রমুখ বক্তব্য রাখছিলেন, তখন কীন ব্রিজের ওপর থেকে একটি পুলিশ ভ্যান নিচে নেমে আসছিল। পুলিশ ভ্যানটি সিলেট সমাচার সম্পাদক জনাব আব্দুল ওয়াহেদ খানকে গ্রেফতার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফেরত আসছিল। এমন সময় জনসভা থেকে একদল উচ্ছৃঙ্খল লোক পুলিশ ভ্যানে হামলা চালায়। তারা পুলিশ ভ্যান থেকে ড্রাইভার ও একজন হাবিলদারকে নামিয়ে নেয়। এ সময় সার্কিট হাউসের আউটার কর্ডনে কীন ব্রিজের পাদদেশে অবস্থানরত পুলিশ একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে জনতাকে লক্ষ্য করে প্রথম গুলি ছুঁড়ে। এই গুলিতে ঘটনাস্থলে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি নিহত ও ৬ জন আহত হয়। জনতার হাত থেকে ড্রাইভার ও হাবিলদারকে আহত অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে।

গুলিবর্ষণের সাথে সাথে সমগ্র শহর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। জনতার ছোট ছোট মিছিলগুলো বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। প্রায় এক ঘণ্টা শহরে পুলিশের সাথে জনতার সংঘর্ষ চলে, চলে গুলিবর্ষণ। জনতা এক সময় বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়িতে আক্রমণ চালিয়ে ফাঁড়িটি দখল করে নেয়। পুলিশ অফিস, জেলা প্রশাসকের বাসভবনে ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে।

বেলা সাড়ে ১২টার দিকে সারা পৌর এলাকাসহ শহরতলীর কিছু এলাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করা হয়। কারফিউ জারির কথা ঘোষণা করার পর পরই সমস্ত শহর জনশূন্য হয়ে পড়ে।

www.nagorikpathagar.org

গুলিবর্ষণে আহতদের একজন নুরুল আমীন (২৫) ঐ দিনই হাসপাতালে প্রাণ ত্যাগ করেন। লাঠিচার্জ, গুলিবর্ষণের ফলে প্রায় দুশ' লোক আহত হন। এর মধ্যে ৬০ ব্যক্তি সিলেট হাসপাতালে ভর্তি হন। ভয়ে এবং কারফিউজনিত কারণে অনেক আহত ব্যক্তি হাসপাতালে যাননি। আহতদের মধ্য থেকে ৮ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়। সরকারিভাবে ২রা ও ৩রা মার্চের ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করা হলেও মৃত্যুর সংখ্যা আরো বেশি বলে বিভিন্ন বেসরকারি মহল দাবি করেন।

রাতে সার্কিট হাউসে অবস্থানরত খাদ্য উপমন্ত্রী জনাব ইকবাল হোসেনের উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসন একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রণয়ন করেন। কিন্তু পর দিন সংবাদপত্রগুলোতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রদত্ত প্রেসনোট প্রকাশিত হয়। এই প্রেসনোটে বলা হয়, 'সরকার সিলেটে গুলিবর্ষণের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন ও মহানবী (দঃ) সম্পর্কে আপত্তিকর নিবন্ধ লেখকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু, সিলেট সমাচার-এর সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। প্রেসনোটে বলা হয়, উন্মত্ত জনতা সাকিট হাউস আক্রমণ করে। খাদ্য উপমন্ত্রী সেখানে ছিলেন। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে মন্ত্রীর হাউস গার্ড গুলিবর্ষণ করে। এতে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়।' অবশ্য জেলা প্রশাসক স্বাক্ষরিত খসড়া প্রেস রিলিজে এ কথা ছিল না। তাই প্রশ্ন উঠেছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ ভাষ্যের সূত্র কি?

৪ঠা মার্চ : কারফিউকবলিত সিলেট শহরের রাস্তাঘাট ফাঁকা দেখা যায়। যেন জনপ্রাণীহীন মৃত শহর সিলেট। দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত মাত্র ২ ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল হলে শহরের কাঁচাবাজারে অস্বাভাবিক ভিড় জমে। সমগ্র শহরের মানুষ হঠাৎ করে রাস্তায় নেমে আসেন। প্রতিক্রিয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। চালের দাম ২২৫ থেকে ২৫০ টাকায় ওঠে। মাছ, তরিতরকারী দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। জনজীবনে নেমে আসে দুর্ভোগ এবং ঐ দিন ১২টি রাজনৈতিক দল এক সভা শেষে বিবৃতি প্রকাশ করে। সভায় সংসদ সদস্য শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্তও উপস্থিত ছিলেন। বিবৃতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও হাঙ্গামার প্ররোচণার জন্য বিএনপি নেতা সংসদ সদস্য খোন্দকার আব্দুল মালিক ও পৌর চেয়ারম্যান বাবরুল হোসেন বাবুলকে দায়ী করা হয়। বিবৃতিতে

www.nagorikpathagar.org

হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, আহত ও নিহতদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দান, গ্রেফতারকৃতদের বিনা শর্তে মুক্তি, নিবন্ধ লেখকের বিচার এবং কারফিউ প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

অন্যদিকে পৌর চেয়ারম্যান বাবরুল হোসেন বাবুল ঘটনার জন্য জেলা প্রশাসনকে দায়ী করে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, জেলা প্রশাসক যথাযথ ব্যবস্থা নিলে ঘটনার এই পরিণতি হতো না।

কারফিউ চলাকালে টহলরত একটি পুলিশের গাড়ি দেখে পালাতে গিয়ে জালাল মিয়া নামক জনতা ব্যাংকের একজন পিয়ন কীন ব্রিজ থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন ও পরে সিলেট হাসপাতালে মারা যান। এই দিন স্থানীয় ঘড়িঘরের নিচে অপর একটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তবে পুলিশ বলেছে, এটা স্বাভাবিক মৃত্যু।

৫ই মার্চ : পরিস্থিতির উন্নতি লক্ষ্য করে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এদিন সকাল ১টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করেন। এদিন সিলেট সরকারি কলেজের ছাত্ররা একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি শহরে এসেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

সিলেট পৌরসভা কমিটি ২রা ও ৩রা মার্চের ঘটনার জন্য জেলা প্রশাসককে দায়ী করে অবিলম্বে খুনি জেলা প্রশাসকের অপসারণ ও শাস্তি দাবি করে বিবৃতি প্রদান করে।

ঢাকা থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যথা আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী, লেবার পার্টি, জাতীয় জনতা পার্টি বিবৃতি প্রদান করে। একটি ছাত্র সংগঠন ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিলও বের করে।

জাতীয় জনতা পার্টি প্রধান জেনারেল (অবঃ) ওসমানী সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে সিলেট সমাচারকে বিরোধীদলীয় পত্রিকা বলে আখ্যায়িত করে ক্ষমতাসীন দলের একটি মহল এই পত্রিকাকে বন্ধ করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল বলে অভিযোগ করেন। তিনি সিলেটের ঘটনাবলীর জন্য এই মহলের বাড়াবাড়িকে দায়ী করেন।

৬ই মার্চ : পরিস্থিতির অধিকতর উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে ঐ দিন সকাল ৭টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হয়।

সকাল থেকেই স্থানীয় বেতারে ১২ জন আলেমের এক বিবৃতি প্রচার করা

www.nagorikpathagar.org

হয়। এই বিবৃতিতে ২রা ও ৩রা মার্চের ঘটনাবলীর জন্য একটি ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধকামী দলের কার্যকলাপকে দায়ী করা হয়।

ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ কমিটি জুম্মার নামাজ শেষে মসজিদে মসজিদে নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত এবং পরে এক কর্মী সভায় ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, আহত-নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দান, গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি, সিলেট সমাচারে নিবন্ধ লেখক সরদার আলাউদ্দিনের ফাঁসি, সিলেট সমাচার সম্পাদকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও সিলেট সমাচারের ডিক্লারেশন চিরতরে বাতিলের দাবি জানানো হয়।

সরকার সিলেটের অতিরিক্ত দায়রা জজ জনাব মোশাররফ হোসেনকে দিয়ে এক সদস্যের একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করেন।

৭ই মার্চ সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, ৮ই মার্চ সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত, ৯ই মার্চ ভোর ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ও ১০ই মার্চ ভোর ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হয়।

৯ই মার্চ সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা নিহতদের জন্য গায়েবি জানাযা ও এক শোকসভার আয়োজন করে। অন্যদিকে ৬ই মার্চ বেতারে প্রচারিত বিবৃতির সাথে সম্পর্কহীনতার কথা জানিয়ে হাজী কুদরত উল্লাহ মসজিদের ইমাম মাওলানা জমির উদ্দীন এক বিবৃতি দেন।

এদিকে ১০ই মার্চ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্যোগে একটি লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়। জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহিমকে আহ্বায়ক মনোনীত করে গঠিত এই কমিটি নিহত-আহত, ধৃত ও নিখোঁজ ব্যক্তিদের নাম-ধাম, পরিচয় সংগ্রহ এবং তালিকা প্রস্তুত করার কাজে হাত দেন। এই কমিটি বন্দীদের মুক্তি ও কারফিউ প্রত্যাহারের দাবি জানায় এবং তদন্ত কমিশনের ব্যাখ্যা দাবি করে।

সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট শহীদ এক বিবৃতিতে পত্রিকায় প্রকাশিত জেনারেল (অবঃ) ওসমানীর বক্তব্যকে খণ্ডন করে বলেন যে, সিলেটের ঘটনার জন্য তিনি বিএনপির ওপর যে দোষারোপ করেছেন, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

২রা ও ৩রা মার্চের ঘটনায় গ্রেফতারকৃতদের জামিনে মুক্তি দেয়া হয়।

১১ই মার্চ : বিরোধী দলের কর্মসূচি : সিলেটের ১২টি বিরোধী রাজনৈতিক

www.nagorikpathagar.org

দল দুপুর ২টায় স্থানীয় রেজিস্ট্রারি মাঠে পুলিশের গুলিবর্ষণে নিহতদের উদ্দেশ্যে গায়েবি জানাযার আয়োজন করে। গায়েবি জানাযা শেষে একটি মৌন মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে।

গ্রেফতারকৃত ৫৫ জন ব্যক্তি আদালত থেকে জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

১৩ই মার্চ : শহর থেকে কার্ফু প্রত্যাহার করা হয়।

প্রাসঙ্গিক কথা : আপত্তিকর নিবন্ধ প্রকাশের পর বিশেষ সংখ্যা বের করলেও সিলেট সমাচার-এর প্রতি জনতার ক্ষোভ প্রশমিত না হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ধারণা করা হয়।

প্রকাশিত হবার পর থেকে সিলেট সমাচার যে ভূমিকা পালন করে আসছে, তাতে সিলেটের বিভিন্ন মহল এই পত্রিকাটির সাংবাদিকতার নীতিমালা লংঘন করেছে বলে মনে করেন। বিভিন্ন সময়ে সমাচার ব্যক্তি আক্রোশ মেটানোর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল বলে এই মহলের ধারণা। তাছাড়া এই পত্রিকাটি প্রকাশের ইতিহাসও পরিচ্ছন্ন নয়। বিপুল পরিমাণ সরকারি সম্পত্তি আত্মসাতের মধ্যদিয়ে এই পত্রিকার জন্ম বলে এই মহল অভিযোগ করেছেন।

বাসস-এর অফিস ও তার ব্যাখ্যা : ১৯৭৪ সাল থেকে সিলেট শহরের হাসান মার্কেটস্থ একটি পরিত্যক্ত দোকানে বাসস অফিসের সাইন বোর্ড লাগানো হয়। সিলেট সামাচার-এর সম্পাদক আব্দুল ওয়াহেদ খান তখন সিলেটে বাসস-এর প্রতিনিধিত্ব করতেন। বাসস-এর অফিস হিসাবেই এই ঘরটি সরকার থেকে বন্দোবস্ত নেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে (সমাচার প্রকাশের অনেক পর) এখানে সিলেট সমাচার-এর বাণিজ্যিক কার্যালয়ের সাইন বোর্ড লাগানো হয়।

৩রা মার্চের ঘটনার পর সরকারি প্রেসনোটে এই ঘরটিকে বাসস কার্যালয় বলে উল্লেখ করা হলে বাসস কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানান, সিলেটে বাসস-এর কোন অফিস নেই এবং সমাচার সম্পাদক ১৯৭৮ সাল থেকে বাসস-এর সাথে কোন অবস্থাতেই জড়িত নন। প্রতীয়মান হয়, বাসস-এর সাথে যোগাযোগ ছিন্ন হবার পর বাসস-এর নামে নেয়া ঘরটি সরকারের কাছে সমর্পণ না করে নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত করার প্রয়াস ছিল।

খাদ্য উপমন্ত্রীর ভূমিকা : ৩রা মার্চ হরতাল চলাকালে খাদ্য উপমন্ত্রী ইকবাল হোসেন চৌধুরী সিলেট এসে সার্কিট হাউসে উঠেন। প্রথম গুলিবর্ষণের সময় তিনি সার্কিট হাউসে অবস্থান করছিলেন। পরিস্থিতির অবনতি রোধকল্পে

www.nagorikpathagar.org

তিনি সমস্ত দিন প্রশাসন, বিএনপি নেতৃবৃন্দ ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ কমিটির সাথে যোগাযোগ করেন। তাঁর সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ কমিটি সংগ্রামে সাফল্যের জন্য সন্তোষ প্রকাশ এবং জনগণকে শান্তিপূর্ণ জীবনে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেন।

এছাড়া তিনি টেলিফোনে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সাথেও যোগাযোগ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার প্রচেষ্টা চালান।

জনমত : এদিকে সিলেটে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ রয়েছে। জেলা প্রশাসকের অপসারণ দাবি করেছে বিরোধী দল, বিএনপির কিছু নেতা এবং অন্যরাও। এই মহলের মতে, যথাসময়ে ঘটনার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিলে এই পরিস্থিতি সহজেই এড়ানো যেত।

সিলেট সমাচার ও তার জন্ম কথা : সরকারি ঘোষণার মধ্যদিয়ে যে সাপ্তাহিক পত্রিকাটির আপাত দৃষ্টিতে মৃত্যু ঘটলো, সেই পত্রিকাটি প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল ১৯৭৭ সালের ৪ঠা আগস্ট। মাত্র তিন বছর সাত মাস পর এই পত্রিকাটির জীবন শেষ হয়ে এলো।

সিলেট জেলা বোর্ডের একটি প্রেস 'মোজাহিদ প্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ষাটের দশকের প্রথম দিকে। এখান থেকে জেলা বোর্ডের মুখপত্র মাসিক জালালাবাদ ও দ্য সিটিজেন প্রকাশিত হতো। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত জালালাবাদ প্রকাশিত হয়। দ্য সিটিজেন প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় প্রকাশের কিছু দিন পর।

১৯৭২ সালের পর এই প্রেসটি জেলা বোর্ড জনৈক নজির আহমদের কাছে বন্দোবস্ত দেন। ১৯৭৫ সাল থেকে জেলা বোর্ড 'মাসিক শ্যামল' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেও তা ছাপা হতো অন্য প্রেসে।

১৯৭৬ সালে জেলা প্রশাসক হিসেবে সিলেটে আসেন জনাব মুহম্মদ ফয়েজ উল্লাহ। তিনি 'শ্যামল' প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে তিনি জেলা বোর্ডেরও চেয়ারম্যান ছিলেন।

কিছু দিন পর জেলা প্রশাসক মোজাহিদ প্রেসের বন্দোবস্তকারীদের প্রেসটি ফেরত দানের অনুরোধ জানান। প্রেসটি ফেরত দেয়া হয়। এটাকে তিন বছরের জন্য সিলেট সমাচারের সম্পাদকের নামে বন্দোবস্ত দেয়া হয় এবং বন্দোবস্ত

www.nagorikpathagar.org

লাভের পর পরই এখান থেকে সিলেট সমাচার প্রকাশ শুরু হয়। মোজাহিদ প্রেসের অফিস পরিণত হয় সমাচারের অফিসে। আর মোজাহিদ প্রেসের নাম পরিবর্তিত হয় 'সমাচার মুদ্রায়ণ'-এ।

প্রথমেই জেলা বোর্ড থেকে অনুদান হিসেবে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে সমাচার প্রকাশনা শুরু হয়। পরবর্তীকালে প্রতি বছরই সমাচার জেলা বোর্ড থেকে অনুদান লাভ করতো।

নতুনভাবে বন্দোবস্ত লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত জেলা বোর্ড প্রেসের কোন খাজনা পায়নি। উপরন্তু এই প্রেসটি নাকি সমাচার সম্পাদকের নামে নামমাত্র মূল্যে হস্তান্তরিত হওয়ারও প্রস্তাব অনুমোদিত হয়ে আছে।

'সমাচার'-এ পর্যন্ত জেলা বোর্ড থেকে ১ লাখ ৪ হাজার টাকা অনুদান পেয়েছে বলে এক হিসাবে জানা গেছে। তাছাড়া জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞাপনের আনুকূল্য লাভের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করেছে।

জেলা প্রশাসক জনাব ফয়েজউল্লাহ্‌র বদলির পর সমাচারের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হতে থাকে প্রতি সংখ্যায়।

এই তিন বছর সাত মাসকালীন সমাচার প্রায় ১ বছর প্রকাশিত হয়েছে সম্পাদকের নামবিহীন সম্পাদকীয় ছাড়া ২ সপ্তাহ। পূর্ব ঘোষণা দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেনি অন্তত ৫ বার। ৫০টি খবর অসমাপ্ত অবস্থায় ছাপা হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যায় ছাপার ঘোষণা কার্যকর হয়নি।

বিশেষ সংখ্যা বের করেছে জেলা প্রশাসক জনাব ফয়েজ উল্লাহ্‌র বদলি, মুষ্ঠিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর সিলেট আগমন, কবি দিলওয়ার ও যুগভেরী সম্পাদক জনাব আমীনুর রশীদ চৌধুরীর সংবর্ধনা, মহিলা কলেজের ৫০ বর্ষপূর্তি, সিলেটে প্রথম প্রাইজবন্ডের ড্র এবং সর্বশেষ নিবন্ধ প্রকাশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জাতীয় দিবসগুলোতেও বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। এছাড়া প্রকাশ তারিখের ডেটলাইন ঠিক রেখে পরবর্তী দিনের খবর প্রকাশ করেছে বেশ ক'টি। এ সময়ে আদালতে মামলা হয়েছে একটি এবং উকিল নোটিশ পেয়েছে কমপক্ষে তিনটি।

প্রকাশ, সমাচারের দালান যে জমিতে অবস্থিত তা অর্পিত সম্পত্তি এবং এ জমিও নাকি বৈধভাবে নেয়া হয়নি। দালানটিও উঠেছে পৌরসভার অনুমতি ব্যতিরেকে।

www.nagorikpathagar.org

সম্পাদকীয় নীতিমালা হিসেবে কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল না। তবে রাষ্ট্রপতি জিয়া এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রতি সম্পাদকীয় সমর্থন ছিল সুস্পষ্ট আর সিলেটের আঞ্চলিক স্বার্থের প্রতি ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন।

উপসংহার : ২রা ও ৩রা মার্চের ঘটনাবলীকে নিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য নিয়ে মাঠে নেমেছেন।

বারোটি রাজনৈতিক দল এই ঘটনাবলীর জন্য বিএনপি নেতা সংসদ সদস্য খোন্দকার আব্দুল মালিক এবং পৌরসভার চেয়ারম্যান বাবরুল হোসেন বাবুলকে দায়ী করেছেন। পক্ষান্তরে বাবরুল হোসেন বাবুল ঘটনার জন্য জেলা প্রশাসককে দায়ী করেছেন এককভাবে। ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়েছে অন্যদিকে।

প্রথমোক্ত বারো দলে রয়েছে আওয়ামী লীগ, জাসদ, সিপিবি, বাসদ আওয়ামী লীগ (মিজান), সাম্যবাদী দল জাতীয় জনতা পার্টি, একতা পার্টি, গণতান্ত্রিক পার্টি, ন্যাপ (মোঃ), ওয়ার্কার্স পার্টি ও ইউপিপি। ইসলামী ঐক্যফ্রন্টে রয়েছে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী, ডেকোক্র্যাটিক লীগ, মুসলিম লীগ ও ইসলামিক ডেমোক্র্যাটিক লীগ (সিদ্দিকী)। ধর্মীয় অনুভূতি কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন এ গোষ্ঠী।

বিএনপি নেতারা বলেছেন, ঘটনার জন্য কারা দায়ী তা নির্ধারণ করবে তদন্ত কমিশন। দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত রিপোর্ট ছিল এ পর্যন্তই।

www.nagorikpathagar.org

রক্ত শপথে মহীয়ান তুমি আঠারোই ফাল্গুন

আফজাল চৌধুরী

অখণ্ড বাংলা-আসামের ঐক্য ভূমি গরীয়ান জালালাবাদের পাহাড়-প্রান্তর ও জনপদ হাজার বছরের তওহীদী ঐতিহ্যের কেন্দ্রস্থল। এখানে বিমূঢ় পৌত্তলিকতার সঙ্গে আলোকজ্জ্বল তওহীদবাদী ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বে একদা 'পশু কোরবানীর অপরাধে' দরবেশ বোরহানউদ্দীনের শিশু সন্তানকে বলি দেয়া হয় দেবতার পাষাণ বেদীতলে। পৌত্তলিক উন্মত্ত রাজা গৌড় গোবিন্দের নির্দেশে বোরহানউদ্দীনের ডান হাতও কেটে দেয়া হয় সেই দিন, ধ্বংস করা হয় তাঁর খানকা, উৎখাত করা হয় তাঁর দীনি তৎপরতা। তাঁকে হাঁকিয়ে দিয়ে তাঁর মুরীদগণকে চড়িয়ে দেয়া হয় শূলে। তওহীদী আলোক প্রজ্জ্বলনের প্রাথমিক প্রয়াসকে এভাবেই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা ও জাহেলিয়াতের ভীম প্রহরণে গুড়িয়ে দেবার অপপ্রয়াসে সুরমা, কুশিয়ারার তীরে তীরে বোরহানের সত্য-সাধনা করুণ কান্নায় অযুত জনতার হৃদয়কে করেছিল ব্যথিত ও উদ্বেল। প্রাচীন শ্রীহট্টের ঐতিহাসিক জনতা সেই দিন ঘোর আচ্ছন্ন ও তমসাবৃত রাজশক্তিকে উচ্ছেদের সংকল্প ব্যক্ত করে নির্যাতিত বোরহানের কাটা হাত ছুয়ে বায়েত গ্রহণ করেছিল। তাঁকে মহান শায়খ হযরত শাহজালাল (রাঃ)-এর দরবারে প্রতিকারের আশায় পাঠিয়েছিল। ফলে হযরত শাহজালাল (রাঃ) নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে এখানে উত্তোলিত হয় তওহীদের বিজয় নিশান আর সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে ঘটে এই অলৌকিক বিজয়ের প্রতিফলন। তবে আজ, পুঁজিবাদী ও নাস্তিক্যবাদী দুই পরাশক্তির দাম্ভিক প্রতিযোগিতায় যখন দুনিয়া প্রতিযোগিতায় বিপর্যস্ত, যখন বিশ্বাসী জনপদসমূহে প্রবেশ করছে অজস্র নেংটি ইঁদুর। জালালাবাদের অলৌকিক মৃত্তিকাতেও রোপিত হচ্ছে অবিশ্বাসী বৃক্ষের চারা। সহসা এখানে গৌড় গোবিন্দের চেলা চামুন্ডারা কুৎসিত জাদুমন্ত্রের বলে, পরাশক্তিদ্বয়ের ইঙ্গিতে যেন কিলবিল করে উঠছে। এদের পৈশাচিক পুনরুত্থান দেখে কাটা হাত নিয়ে মজলুম বোরহান কি আবার দিগন্তে দণ্ডায়মান হলেন আর সগর্জনে জালালী ফৌজ মাঠ থেকে ঘাট থেকে ছুটে চলে আসলো আবার, আবার যেন-

www.nagorikpathagar.org

কাটা হাত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মজলুম বোরহান
তাঁরা দিল দরিয়ায় মউজ
গৌড় গোবিন্দের প্রেতাত্মাকে দেয় শত ধিক্কার
আজ হক জালালী ফৌজ।
আজ মাঠ হতে ছুটে আসে কিষাণের দল
কাজ ফেলে আসে ভুখা-ফাঁকা মজদুর
আজ তরুণের তাজা প্রাণ হয় চঞ্চল
আকাশে বাতাসে রটে জেহাদের সুর
আজ শহীদী রক্তে ঝলসানো খোশরোজ ॥
যেন জনতা আজকে আহত বাঘের মত
চোখে মুখে বুকে নাচে লেলিহান জোশ
কেন গৌড় গোবিন্দ হয় এত উদ্ধত
কুফরী কালামে কেন সে এতই খোশ
জনতা রাখতে চায় এসবের খোঁজ ॥

চতুর্দশ হিজরী শতকের বিদায় লগ্নে জালালাবাদের মসৃণ উর্বর মৃত্তিকায় যখন শুভ পঞ্চদশ হিজরীর খোশ আমদেদ প্রতিধ্বনিত, নব বলে বলীয়ান জনতার বিপ্লবী চিত্তের গভীরতায় যখন নবজাগরণ উদ্বেলিত, তৃতীয় বিশ্বের আসন্ন অভিষেকের সম্ভাব্যতাকে পরখ করার হীন উদ্দেশ্যে পবিত্র আল-কুরআনের ওহী অধিকার নিয়ে তামাশা শুরু করল কতিপয় স্বজাতীয় আত্মবিক্রিত কুসন্তান। জনতা রুখে ওঠল, ফুঁসে উঠল, ঘরে ঘরে দাওয়াত পৌঁছে গেল জেহাদের, আর-

আল-কোরানের যিল্লতি দেখে রুখে ওঠে মুজাহিদ
জালালাবাদের গঞ্জে ও শহরে
প্রাণ বাজী রাখা জঙ্গ-জেহাদে কে হয় আজ শহীদ
সাড়া জাগে তারি জনতার ঘরে ঘরে।
মনে হয় যেন হাজার দেড়েক বছর পারায়ে আজ

www.nagorikpathagar.org

জনতার প্রতি টিটকারী দেয়-বেঈমান রংবাজ
জনতার পাতে তবু সে আহার করে ॥
যাদের ঈমান আক্বিদার ঘরে উঁকি দেয় শয়তান
যাদের পোশাক পরিধান করে লালিত কুসন্তান
কোন্ সাহসে সে কালিমা লেপন করে
জনতার তওহীদী চেতনায় বিজাতীয় জামা পরে ॥

আশ্চর্য এদের দুঃসাহস! পরাশক্তিদ্বয়ের ইঙ্গিতে নৃত্যরত পুতুলগণের সঙ্গে জনতার আচমকা পরিচয় ঘটল, সহসাই হল মোকাবিলা। জনতা ছিঁড়ে ফেলল ওদের মুখোশ। জালালাবাদের মাটিতে বিষবৃক্ষ রোপণের অপপ্রয়াস হল ব্যাহত, ধরা পড়ল বেঈমানে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত রূপ। আসলে এদের রূপ যত বেশি উন্মোচিত হবে ততই জনতার নিয়তি হবে নিষ্কন্টক। তাই জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত, আত্মধিকৃত এ লোকদেরকে তুমি কি চূড়ান্তরূপে জানলে হে জনতা? তুমি কি জানো, যুগে যুগে ইসলাম বৈরী যিন্দিকের দল তোমারই নিমক খেয়ে তোমার বুকেই ছোবল হেনেছে? তোমার সত্তাকে করেছে বিপন্ন, ছিনিয়ে নিয়েছে তোমার জাতীয় স্বাধীনতা, বিনাশ করেছে তোমার প্রাণপ্রিয় রসূল (সঃ)-এর খেলাফত! চিনে নাও, খল, ধূর্ত, তোমারই পরগাছা, তাকে চিনে নাও।

কিন্তু মুনাফিক গোষ্ঠীর মুখোশ উন্মোচন হতে না হতেই ওরা জনতাকে চার্জ করে বসলো। শুরু হলো সংঘর্ষ। বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের ঢলকে বালির বাঁধ দিয়ে রুখবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল কিন্তু বিনিময়ে ফাগুনের রক্ত রাঙা অঙ্গনে, কসবে সিলেটের ফুটপাতে শাহাদাতবরণ করলেন জঙ্গী মুজাহিদ ভাইয়েরা। যারা জীবনের হাসি-আহলাদে ছিলেন প্রাণবন্তু, তওহীদী ঐতিহ্যের মহান আদর্শকে সমুন্নত রাখার তীব্র প্রেরণায় নিজেদের প্রাণসত্তাকে বিলিয়ে দিলেন অনায়াসে। ফলে যারা শাহাদতের এ মহান দৃশ্য অবলোকন করলেন তাঁদের কাছে এই দৃষ্টান্ত অবিস্মরণীয় ইতিহাস হয়ে রইল। কি করে রক্তাক্ত ফুটপাতে লুটিয়ে পড়া আমার ঈমানদার ভাইদের শাহাদাতে এই করুণ ও অবিস্মরণীয় চিত্র আমি ভুলব?

তুমি কি বলতে পারো এ কোন বেরসিক
তুমি কি জানতে সে এক জঘন্য যিন্দিক?
তোমারই ঘরে সেতো

www.nagorikpathagar.org

দুধ ভাত খেয়েছে তো
তোমারই নিমক খেয়ে নিমকহারাম ঘৃণ্য মুনাফিক ॥
তুমি আজ যতই চাও
পালিয়ে সে যে উধাও
তুমি ভাবো যেদিন হবে তার কিছু তওফিক
বুঝি সেও হয়ে যাবে তোমার মতই ঠিক ॥
আমি বলি নয় তা আদৌ
যখনি পাবে সে দাও
তোমার বুকে ছোবল দিয়ে যাবে আকস্মিক ॥

স্মরণীয় তিনশ' ষাট আউলিয়ার সুযোগ্য উত্তরসূরী কারা এই মহাপ্রাণ ভক্তবৃন্দ যারা নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে উঁচু করল তওহিদী রীতি ও ঐতিহ্যকে? প্রথম বারের মোকাবিলাতেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। একজন নও মুসলিম কিশোর ঈমানের জ্বলন্ত পরীক্ষায় শহীদ হলো। সে ছিল এক গরিব এতিম কিশোর, নাম আব্দুল করিম দিলীপ। শাহাদতের পেয়ালায় চুমু দিয়ে তার দ্বীন ইসলাম কবুলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসকে গভীর তাৎপর্যে রক্তাপ্লুত করে দিল সে। সে কে? চায়ের বাগানের মৃত পিতামাতার সন্তান, অবহেলা ও লাঞ্ছনার বেড়ে ওঠা অখ্যাত একটি কালো বর্ণের ছেলে, তার মহান স্রষ্টার সাথে মিলিত হল রক্তলাল অঙ্গরখা পরে। কিন্তু জীবনের রসাস্বাদন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করল বলে প্রিয় নওমুসলিম ভাইটির বিচ্ছেদকে ভুলি কোন্ প্রাণে? কোথায় তারে রাখি, কিভাবে তার শাহাদতের গীত গাই?

নও মুসলিম ভাই
ইয়াতিম ছিল সে যে এই দুনিয়ায়
দুঃখী ছিল হামেশাই
নও মুসলিম ছিল এক ভাই।
আঠারোই ফাল্গুনে সে
সিলেট শহরের কালো পীচে
রক্তের শপথে জান লুটালো
আল্লাহ্‌র পথে অনায়াসে।

www.nagorikpathagar.org

তারে কোথায় রাখি
বল কোথায় রাখি
সে যে আলোর পাখি
সে তো আলোর পাখি
শা'জালালের এই জমিনে
এসো শুইয়ে রাখি তারে
শুইয়ে রাখি।
সে যে কালামপাকের রাহাগীর
সে যে কাবার পথের মুসাফির
শহীদ দিলীপ তার নাম
এসো জিন্দা রাখি তার শির।
নও মুসলিম ভাই
কোরান পাকের রেহাল বুকে নিয়ে
দুনিয়াতে আজ নাই
নও মুসলিম ছিল এক ভাই ॥
ভুলতে পারবো না ভাই আমার ভাইয়ের প্রীতি
আমার বুকে তুফান তোলে শহীদানের স্মৃতি
ফাগুন মাসের কচি কচি পাতার মত যারা
একটি পাতা দু'টি কুঁড়ির স্বপ্নে ছিল হারা
জীবন দিয়ে উঁচু করল তওহীদেরই রীতি ॥
তিনশ ষাট আউলিয়ার দেশে এদের রক্তধারা
মরুপথে হারাবে এই কথা ভাবেন যারা
তারা যতই বলুন এসব আপন ভোলা নীতি ॥
আঠারোই ফাগুন এলে নিজেই হব স্মৃতি
গাইব আমি জীবন ভর এই শাহাদতের গীতি ॥

www.nagorikpathagar.org

প্রাণোদ্বেল আঠারোই ফাল্গুন ছিল সে দিনটি। আপন ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণের বজ্র শপথে নিষ্কাশিত উজ্জ্বল তরবারি সদৃশ এই ক্ষমাহীন দিনে শহীদ আব্দুল করিমের প্রথম কোরবানীতে জনতার বিজয় ঘোষিত হয়ে গেল। ঐতিহ্যমণ্ডিত জালালাবাদের অলৌকিক মৃত্তিকায় ঐ দিনটি মানবজাতির ধর্মাধিকার আদায়ের প্রতীকি দিবস রূপে আশ্চর্য মর্যাদা লাভ করল। ১লা মে যে রূপ শ্রম অধিকার, ফেব্রুয়ারি যেমন মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের জন্য ৮৭ বঙ্গাব্দের আঠারোই ফাল্গুন তেমনি এ দেশবাসীর ধর্মাধিকার সংরক্ষণের জন্য সুচিহ্নিত হল আমাদের চেতনায়।

রক্ত শপথে মহীয়ান তুমি
আঠারোই ফাল্গুন
আঠারোই ফাল্গুন
অভিশাপ পদদলনের দিন
আঠারোই ফাল্গুন
আঠারোই ফাল্গুন।
জালালাবাদের আত্মশক্তি
জাগ্রত যেই দিন
লাখো তরুণের বজ্র শপথে
সংহত সেই দিন
বহু শহীদের রক্তে রাঙানা
জ্বলন্ত সে আগুন
আঠারোই ফাল্গুন ॥
ধর্মের পথে শহীদের ত্যাগ
ব্যর্থ হয় না জানি
ব্যর্থ হবে না তোমার
আমার পরমাত্মীয় বাণী
ঝরাতে হবে না ফুটপাতে
আর হৃদয়ের তাজা খুন

www.nagorikpathagar.org

আঠারোই ফাল্গুন।

মানবাধিকারে গরীয়ান

তুমি আঠারোই ফাল্গুন

আঠারোই ফাল্গুন

ধর্মাধিকার আদায়ের দিন

আঠারোই ফাল্গুন

আঠারোই ফাল্গুন ॥

তবে বিশ্বজনীন সত্য ধর্মের সংরক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্। তাঁর প্রদর্শিত পথে তাঁরই প্রিয় বান্দাদের কোরবানী তিনিই কবুল করেন। যদি এ মহান গণবিস্ফোরণের মহা আবেগ মাবুদের কাছে গৃহীত হয়ে থাকে তবেই জালালাবাদের বিপ্লবী জনতা তথা সমগ্র বিশ্ব মুসলিম তথা সকল ধর্মাবলম্বীর জন্য আছে। কেন না, ওগো আমার প্রভু। আমাদের স্মরণ ও জীবনসাধন যে এক তোমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। হে জগৎ প্রভু! হে আল্লাহ্! আঠারো ফাল্গুনের এ আত্মত্যাগ তুমি কবুল করলে কি না, তা জানিয়ে দাও, জানিয়ে দাও-

দয়াল আল্লাজী। আমার

দয়াল আল্লাজী।

তোমার নামে জান দিলাম যে

কবুল করলানি? মওলা কবুল

করলানি?

২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ সালে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত।

সরদার আলাউদ্দিন এখন কোথায় আছেন জানি না। তিনি কি মৃত না জীবিত তাও জানি না। তার সম্পর্কে যদি কেউ কোন তথ্য দিতে পারেন, তাহলে পরবর্তী সংস্করণে তা কৃতজ্ঞতার সাথে সংযোজিত হবে। এ ব্যাপারে বিশেষ করে কবি আফজাল চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত বই

১। অপসংস্কৃতির বিভীষিকা (১ম খন্ড)
২। জহুরীর জাম্বিল (১ম খন্ড)
৩। জহুরীর জাম্বিল (২য় খন্ড)
৪। খবরের খবর
৫। ধূম্রজালে মৌলবাদ
৬। প্রেস্টিজ কন্‌সার্ণড
৭। মস্তানদের জবানবন্দী
৮। তিরিশ লাখের তেলেসমাত
৯। ক্রীতদাসের মত যাদের জীবন
১০। তথ্য সন্ত্রাস
১১। স্বজন যখন দুশমন হয়
১২। শব্দ সংস্কৃতির ছোবল (পরবর্তী বই)

প্রাপ্তিস্থান ঃ
তাসনিয়া বই বিতান
৪৯১/২. ওয়্যারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।